আঁধারে ঘেরা

‘আয়নাঘর’

[স্বৈরাচারী হাসিনার হাতে গড়ে উঠা টর্চার সেল]

সংকলনেঃ জুনাইদ জিহাদ

আয়নাঘরনামা ০১

আয়নাঘরনামা ০২

আয়নাঘরনামা ০৩

আয়নাঘরনামা ০৪

আয়নাঘরনামা ০৫

আয়নাঘরনামা ০৬

আয়নাঘরনামা ০৭

আয়নাঘরনামা ০৮

আয়নাঘরনামা ০৯

আয়নাঘরনামা ১০

আয়নাঘরনামা ১১

আয়নাঘরনামা ১২

আয়নাঘরনামা ১৩

আয়নাঘরনামা ১৪

আয়নাঘরনামা ১৫

আয়নাঘরনামা ১৬

আয়নাঘরনামা ১৭

আয়নাঘরনামা ১৮

আয়নাঘরনামা ১৯

আয়নাঘরনামা ২০

আয়নাঘরনামা ২১

আয়নাঘরনামা ০১

কোন এক গোয়েন্দা সংস্থায় প্রধানের কক্ষ । বিশাল রুম । সোফা, চেয়ার দিয়ে সুন্দর করে সাজানো । পাশেই ঘুমানের জন্য আলাদা রুম । নিয়ে এসে বসিয়ে দেয়া হলো রুমের ঠিক মাঝ খানে । প্রায় ভাংগা প্লাস্টিকের চেয়ারে। হাত পিঠমোরা করে হ্যান্ডকাপ লাগানো । প্রধানের আদেশে জম টুপি খুলে দেয়া হলো । গুমের তখন এক মাসের বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে । খাবারের অভাবে শরীরে শক্তি ছিল না। অল্পতেই প্রচন্ড ঠান্ডা লাগত । অন্ধকার আর আলো বাতাস ফ্যান ছাড়া থাকতে থাকতে এসিতে গেলেই কাপতে থাকতাম । আমাকে কাপতে দেখে কোন একজন এসির পাওয়ার বারিয়ে দিলো । এরপর আমার পরিচয় দেয়া হলো । পরিচয় পর্বের পর , সোজা অকথ্য ভাষায় গালি দিয়ে জিজ্ঞেস করলো । তোরাই তো হেফাজত চালাস তাই না? সব আন্দোলনের মুল হোতাই তোরাই । শাতীম নিয়ে এত মাথা ব্যাথা কেন ? তোর জন্য তো তোর বাপের মাথা কাটা গেছে , বলে বাবা এমন কি বোন কে তুলেও গালি গালাজ করতে বাদ রাখেনি ।

তার নিচের অফিসার বলে উঠল স্যার এ যা করছে এরে তো নিম্নে তিনবার ক্রস ফায়ার দেয়া যায়। শুধু ওর বাপের কথা ভেবে এখনো দেই নাই । এই মাদা**** কোন দিন ভালো হবেনা । এরে মামলা দিয়ে কোন লাভ নাই ।

এরপর কেটে গিয়েছিল আরো অনেক মাস। কখনো ভাবি নি আবার সূর্য্যের আলো দেখব । প্রতিদিন চোখ খুলে যখন পায়ের নীচের বাথরুম টা দেখতাম , ভাবতাম আজ হয়ত শেষ দিন , আর দেখবো না এই বাথরুম। সেলের শিক গুলো , সেলের টাইলগুলো গুনতে গুনতে কখন যে ঘুমিয়ে যেতাম টের ও পেতাম না। সেলের সামনের সাদা দেয়াল আর লাইট টা এক সময় ঝাপসা লাগত । সেলের সামনে কখনো পিপিলিকার দল লাইন ধরে আলোর দিকে ছুটে চলত , আর ভাবতাম আমিও একদিন মিছিলে শামিল হবো। আবার ট্রাফিক , রিকশার টুংটাং শব্দ , ফেরিওয়াল চিৎকার চায়ের দোকানের আড্ডায় শামিল হবো । আলাহামদুলিল্লাহ আমার রব আমাকে সেই স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত করেন নি । তবে অনেকেই এখনো রয়ে গেছেন সেই অন্ধকার নিরব সেলে ।

আয়নাঘরনামা ০২

আয়নাঘরের জবানবন্দি :

*এখানে সব probable threat কে আটক করে রাখা হতো।কিন্তু আটক দেখানো হতোনা।সবাই জানতো তিনি গুম হয়েছেন!

*এখানে জঙ্গীবাদ ট্যাগ লাগানো ,সাবেক আর্মি অফিসার,বিরোধী দলীয় থ্রেট সবাইকেই রাখা হতো।

*গুম করার পরেই চোখ বেধে ফেলা হতো তাই কারো পক্ষে এটার অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

*এটার সঠিক অবস্থান এখনো ক্লিয়ার হয়নি।তবে এই জায়গাটা সাউন্ড প্রুফ।একজন বন্দীর জবানবন্দি :

এখানে সাইন্ড যেনো বাইরে না যায় এজন্য পুরোটা সাউন্ড প্রুফ ছিলো।বড় বড় এগজস্ট ফ্যান সবসময় চলতো সাউন্ড যেনো বাইরে না যায়।

ফ্যান বন্ধ করলে কান্নার আওয়াজ আসতো যা অন্য বন্দিরা সহ্য করতে পারতেন না।তাই বেশিক্ষণ ফ্যান বন্ধ রাখা হতোনা।

*প্রধান রুমগুলোতে দুই লেয়ারের দরজা আছে সেখানে।প্রথমে লোহার একটা দরজা তারপর কাঠের দরজা।আলো আসার জন্য একটা ছিদ্র।

*প্রতিবার মারধর করার পর অনেকদূর হাটিয়ে নিয়ে একটা গরম রুমে রাখা হতো।

* নির্দিষ্ট একটা সময়ে ফ্যানটা একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া হয়, একেবারেই নিঝুম হয়ে যায়। মনে হচ্ছিল যে আপনি পৃথিবী থেকে আলাদা কোন জায়গায় আসছেন, কোন শব্দ নাই, একেবারেই নিঝুম হয়ে যায়, এইটা নির্দিষ্ট, মেবি আপনার ৩০ মিনিট ৪০ মিনিটের জন্য।” □□তিনি যোগ করেন, “এই সময় [লিটন এক ব্যাক্তির সাথে] কথা বলতো। তারা ওয়ালের মধ্যে আঘাত করতো, আঘাত করার পরে ওইপাশ থেকে কথা বলতো। [...] উনি [লিটনকে] বলছে যে হয়তো [সেলিম] খুব দ্রুত ছাড়া পাবে, তো আমার নাম্বারটা টয়লেটে লেখা আছে, সব টয়লেটে। উনি বলছে যে সব টয়লেটে ওনার নাম্বার উনি লিখে রাখছে। তো আমি অনেক টয়লেটে ওনার নাম্বার দেখছি। তো উনি তখন বলল যে, ওনার মা যেন সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে, ওনাকে কাফরুলের আশেপাশে কোথাও রাখা হইছে। ওই লিটন আমাকে বলছে [পাশের রুমের ওই ব্যক্তি] ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের একজন টিচার ছিলেন, এতটুকুই।”

*বন্দিরা হাড্ডি দিয়ে ওখানে অনেক জিনিস লিখে রাখতেন।অনেক হাহাকার কষ্টের কথা দেয়ালে লিখে রাখতেন।সবগুলো রুম আচড় কেটে লেখা দিয়ে ভর্তি।

* ওনারা ওইসময়ই মাইর শুরু করে, আপনার মানে কোন দিক থেকে বারি দেয় আমি অনুভব করতে পারি নাই বাট ডানে বামে, মানে আমি এই দিগে কাইত হইলে ওইদিগে বাড়ি দেয়, পায়ে বারি দেয় ডান পাশে বাম

পাশে খুব জোরে জোরে মারে, তো আমিও খুব কান্নাকাটি করি। সব বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তো একটি চুপ করে রইলো ওনারা। ওই মহিলা হঠাত করে জিজ্ঞেস করলো, শেখ মোহাম্মদ সেলিম, আপনি কখনও পঞ্চগড় গেছেন? আমি বললাম যে, না। তারপরে জিজ্ঞেস করলো যে, আমাকে সম্ভবত আপনার গোপালগঞ্জের যে কোন একটা এরিয়ার নাম বলল, যে আপনি গোপালগঞ্জ সম্ভবত কি জানি কোটোআলীপাড়া হয়তোবা মেবি এইরকমই কোন একটা নাম হতে পারে। যে ওইখানে আমি নাকি বোমা পুঁতে রাখছিলাম শেখ হাসিনাকে হত্যা করার জন্য।কিন্তু এটা শুধুমাত্র তাদের সন্দেহ ছিলো।

স্রেফ সন্দেহ করে একটা মানুষকে গুম করে ফেলা যায়?

যারা বলছিলেন আগে অনেক ভালো ছিলেন,তাদের জন্য অনেক হাজারো লক্ষ ইতিহাস তুলে ধরা যাবে।

সামনে ভালো থাকবেন কিনা জানিনা।বাংলাদেশে ঘুরে ফিরে এসব বারবার আসে,ভিন্ন কোনো নামে।

আয়নাঘরনামা ০৩

গুম সেন্টারে এক প্রহরী, দেখতে খুব বাজে। রোজা রাখলে চিল্লাচিল্লি করতো।

তো এক বন্দী বলে, স্যার! ও আচ্ছা ওদের আবার স্যার ডাকতে হয়!

তো বলে স্যার, আপনাকে না যাক্কুম বৃক্ষের মত লাগছে।

তো প্রহরী বলে, এইটা কি জিনিস?!

তো বন্দী বলে, এটা হল আখিরাতের একটা গাছ!

বেকুব প্রহরী তো আখিরাতের গাছ শুনে খুশিতে গদ গদ হয়ে গেলো। না জানি কত মর্যাদার জিনিস!

অথচ এটা হচ্ছে জাহান্নামের গাছ, যেটা দেখতে শয়তানের মাথার মত। যেটার ফল জাহান্নামীরা খাবে।

আয়নাঘরনামা ০৪

আমার নিজের জীবনের একটা ঘটনা বলি। মনে হয় এখনই উপযুক্ত সময়। এরপর হয়তো নাও বলতে পারতে পারি।

আমি আগের পোস্টে একজন ভাইয়ের কথা বলেছিলাম, আরু। এটা উনার মূল নাম না, আমি ভালোবেসে বলতাম। আরাহানের সংক্ষিপ্ত। উনি ছিলেন আমার মেন্টর, আমার গুরু, আমার খুব ভালোবাসার মানুষ।

একজন অসাধারণ দাঈ ইলাল্লাহ। উনার সংস্পর্শে আসলে যে কেউ দ্বীনের দিকে প্রভাবিত হতে বাধ্য হত।

স্মিতভাসী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। দাওয়াহ ছিল উনার ধ্যান-জ্ঞান। বিয়ে থা করেন নি, নিজেদের ক্যারিয়ারও এভাবে গড়তে চেয়েছিলেন যেন দাওয়াহ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এজন্য ফ্রি ল্যান্সিং করতেন।

পরিবার বলতে মা ছিলেন, আর দেশের বাইরে প্রবাসী এক বোন।

অনলাইনে স্বল্প এক্টিভ ও স্বল্প পরিচিত ছিলেন।

.

একজন অসাধারণ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আমি অনেক আগে ইমাম গাযালীকে [রাহ.] নিয়ে তাঁর পড়াশোনার ব্যাপারে লিখেছিলাম। স্লো রিডার ছিলেন, তবে যা পড়তেন ভালোমত পড়তেন। অনেকে আমাকে বলেন যে আমার দর্সের ভালো বৈশিষ্ট্য হল সেগুলো জীবনের সাথে রিলেইটেবল। এই গুণটা আমি উনার কল্যাণে অর্জন করেছি, আলহামদুলিল্লাহ। উনিই আমাকে শিখিয়েছিলেন, যা পড়ছেন তা যদি জীবনে এপ্লিকেবল না হল, জীবনের সাথে মেলাতে না পারলেন তাহলে আসলে এর ভেল্যু নাই।

উনি আমাকে শিখিয়েছিলেন, জীবনের যে কোনো পরিস্থিতিতে আগে চিন্তা করবেন এই পরিস্থিতিতে সাহাবারা কেউ পড়লে কী সিদ্ধান্ত নিতেন? এই চিন্তাটা আমার জীবনের মোড় ঘুড়িয়ে দিয়েছে।

.

আমি তো একজন চপল যুবকই ছিলাম, তিনি আমাকে স্থির পুরুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছেন। আমার বিভিন্ন ত্রুটি দেখিয়ে দিতেন, পরামর্শ দিতেন। যে কোনো সিচুয়েশনে পড়লে আমি তাঁকে আগে নক দিতাম। আমার ভাইয়ের চেয়েও বেশি আপন ছিলেন। বলে না দ্বীনি ভাই, উনি আমার প্রকৃত দ্বীনি ভাই ছিলেন।

.

২০২১ এর শেষের দিকের কথা। একদিন আমার বাসায় এলেন, অনেকক্ষণ কথা হল। এই শেষবার। উনার মা প্রচণ্ড অসুস্থ ছিলেন, মস্তিষ্কে সমস্যা হয়ে গিয়েছিল। বাইরে বেশিক্ষণ থাকতে পারতেন না। আন্টি বাচ্চার মত হয়ে গিয়েছিলেন। উনাকে আমি অনেকবার বলেছিলাম, আপনি দেশের বাইরে চলে যান। উনি রাজি হন নি। যা-ই হোক, উনি চলে গেলেন। কিছুদিন পরে উনি নক দিলেন, জানালেন আন্টি মারা গেছেন। কিছু প্রয়োজনীয় মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন।

.

এরপর তাঁকে আর খুঁজে পেলাম না। কিছুদিন পর এক ভাই প্রথম আলোর সংবাদ দিলেন, যেখানে দেখলাম উনাকে তমুক সংগঠনের কী কমান্ডার দেখিয়ে চালান দিয়েছে! আমি জাস্ট স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ৬ ফুট লম্বা অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান মানুষ ছিলেন। তবে খেতেন অনেক কম। উনার গ্রোথ ছিল বেশি। সেই মানুষকে ছবিতে একদম চিমসে দেখাচ্ছিল। বুঝতে পারলাম যে অনেক টর্চার সয়েছেন। প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছিলাম। উনার জন্য দিনের পর দিন দুআ করে গেছি।

.

কিছু দিন পর এক পূর্ব পরিচিত ভাই নক দিলেন। পূর্ব পরিচিত হলেও অনেক দিন যোগাযোগ ছিল না। উনাকেও উনার বাসা থেকে প্রথমে গুম করা হয়। কিছুদিন পর কয়েকটা মিথ্যা মামলায় চালান দেয়। আরাহান ভাই এর সাথে উনার একটা কমন মামলা ছিল(!) খুবই হাস্যকর বিষয়, তবে এটাই হয়েছে।

.

কাশিমপুরে একই সেলে উনারা কিছুদিন একসাথেও ছিলেন। সেই ভাই তখন জামিনে। উনি আমাকে এমন কিছু কথা জানান যা আসলে আমার প্রচণ্ড শক দেয়।

.

আরাহান ভাইকে সহজে ১৬৪ ধারা জবানবন্দি নেয়ানো যায় নি। উনার পরিবারের কেউ দেশেও ছিল না যে তাঁর কথা বলে ব্লেকমেইল করবে। এরা আমার নাম নিয়েছিল। হুমকি দিয়েছিল যে উনি ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি না দিলে আমাকে ওঠানো হবে! এরপর তিনি আর বাঁধা দিতে পারেন নি। আমার দুর্বলতা সম্পর্কে তিনি খুব ভালো জানতেন। জানতেন আমার পক্ষে সেখানে টেকা অসম্ভব। আরাহান ভাই ১৬৪ দিলেন।

.

আমি এটা জানার পর জাস্ট ভেঙে পড়ি মানসিকভাবে।

এই সময়ের আরও কিছু ঘটনাও জানা দরকার। এই সময়টাতেই আমার বাসার সামান্য সামনে প্রতিদিন রাতে সুনির্দিষ্ট সময়ে তাদের কুখ্যাত ব্ল্যাক গ্লাসের গাড়ি দাঁড়ানো থাকতো। বাসার সামনে এভাবে নজরদারিতে থাকা

যে কী পরিমাণ আতঙ্কের সেটা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। আমি রাতে ঘুমাতে পারতাম না। রাতে পড়তাম, ইবাদাতে কাটাতাম। মনে হত, আজই হয়তো নিয়ে যাবে আর পড়ার সুযোগ পাব না।

.

কিছুদিন পর এক ভাইয়ের সাথে কথা হয়, একটা বিশেষ সংস্থার সেকালের মুখপাত্র ছিল তার বন্ধু। তিনি বললেন, সেই অফিসার তাঁকে আমার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন, যেন আমার সাথে না চলেন। আমি সেসময় অনেক চেষ্টা করেছি দেশের বাইরে চলে যেতে, কিন্তু সুযোগ হয়নি আসলে। আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আপনারা খেয়াল করবেন আমি তখন কোথাও গেলে ফেবুতে বলে যেতাম অমুক জায়গায় যাচ্ছি, কোনো ভাই চাইলে দেখা করতে পারেন। এভাবে লোকেশন পাব্লিক রাখতাম। গুগল লোকেশন শেয়ার করতাম পরিচিত জনদের।

.

এর মধ্যেই আমার খুবই স্নেহের ছোট ভাই সাজিদ লাপাত্তা হয়ে গেল। সে উত্তরা হাই স্কুলে আমার জুনিয়র ছিল। আরাহান ভাইয়ের কাছেই বাসা ছিল একসময়। আমি দেখছিলাম পৃথিবীটা ছোট হয়ে আসছে এবং আমার কিছুই করার নাই আর। আমি জাস্ট প্রহর গুণছিলাম। এই সময়টা আমার জন্য একটা ট্রমা টাইম ছিল। ফেবুতে কিছু ব্যাশিং চলছিল, বাস্তব দুনিয়ায় ছিল টেনশন, আমি যে কোথাও যাওয়ার আগে পোস্ট দিতাম, এটা নিয়েও কিছু মানুষ ট্রল করেছে, লাইক অমুক তো নিজেকে বিশেষ কিছু ভাবে!

.

তারপর এক সময় নজরদারি উঠে গেল। মানে বাহ্যিকভাবে আর কি। তাদের আর সামনে দেখতাম না। সেই ভাই নক দিয়ে আরাহান ভাইয়ের ১৬৪ সম্পর্কে জানালেন। আলহামদুলিল্লাহ আরাহান ভাই পরে খালাস পেয়ে যান, মামলাটা পুরো-ই বানোয়াট ছিল। ছোট ভাই সাজিদও এখন বাইরে যতদূর জানি। তবে কারও সাথেই আমি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। আসলে সম্ভবই হয়নি।

.

এরা হচ্ছে মুসলিম বাংলার মেজোরিটি মানুষের আনসাং হিরো। আমি নিজের সমস্যাগুলো ফেবুতে কখনোই লিখিনি। আমার কাছে মনে হয়নি যে লেখার দরকার আছে। আজকে যে লিখছি এটাও নিজের জন্য না, জাস্ট আরাহান ভাইকে স্মরণ করে লিখছি, যাতে উনার ঘটনাটা আপনারাও জানেন।

.

আরাহান ভাই, আপনি যেখানেই থাকুন, ভালো থাকুন, নিরাপদ থাকুন, দ্বীনের ওপর কায়েম-দায়েম থাকুন, আমি আপনাকে অসম্ভব মিস করি। আপনাকে হারানোর পর থেকে আমি আসলে পথে বসে গেছি। জীবনের যে কোনো সমস্যায় যখনই পড়েছি মনে হয়েছে আরুকে নক দেই, পরে খেয়াল হয়েছে আরু তো নেই। আমার

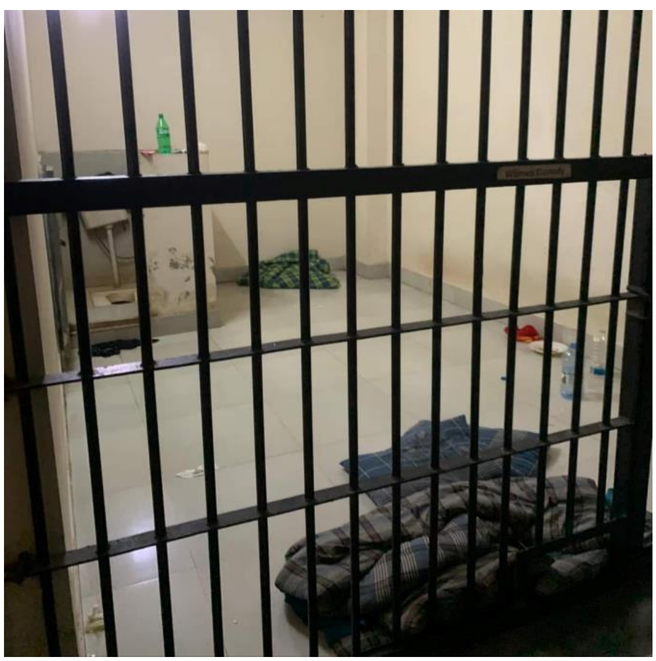
কথা যদি আপনার কাছে পৌঁছায়, কাইন্ডলি যোগাযোগ করবেন ভাই। পরাধীন বাংলায় এই পোস্ট লেখা অসম্ভব ছিল, আজকে সেমি স্বাধীন পরিবেশে না লিখে পারলাম না। আশা করি আমাকে ক্ষমা করবেন, আর এজন্য বকা দেবেন না।

আয়নাঘরনামা ০৫

বাসা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর মিন্টু রোডে সিটিটিসির এই রুমে আমাকে গুম করে রাখা হয়। ১১ দিন গুম এবং ৪ দিন রিমান্ড। মোট ১৫ দিন এই রুমেই থাকতে হয়েছে। এগুলোকে সাধারণত সেল বলে। প্রথম দিন ৩ জনকে আলাদা ৩ রুমে দিলেও কখনো সজীব কখনো ওমর ভাই কখনো আবার ৩ জনকেই এই রুমে রেখেছিল। সাথে গুম হওয়া আরও অনেকেই ছিল। একজন খেটে খাওয়া বয়স্ক মুরুব্বিও ছিল। আমি দুর্বল ও ভীতু হওয়াতে মুরুব্বি অনেক হেল্প করত। পরামর্শ এবং অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করে শান্ত করতো আমাকে।

সাধারণত বিপদে পড়লে আমি নফল রোজা রাখি। সেখানেও রোজা রাখতাম। পাশের সেলে এক গার্মেন্টস ব্যবসায়ী ভাইকে গুম করে রেখেছিল। ঐ ভাই আমাকে মোরগ পোলাও এর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

এই রুমেই খাওয়া ঘুম নামাজ টয়লেট। মুরুব্বির একটা চাদর থাকাতে সেটাকে আমরা জায়নামাজ হিসেবে ইউজ করতাম। কি যে দুঃসহ অভিজ্ঞতার সেই দিনগুলি।



আয়নাঘরনামা ০৬

সেলেসের যেমন টার্গেট থাকে, এদেরও এরকমই কিছু টার্গেট থাকে। টার্গেট মিলাতে এরা যাকে তাকে ধরে এনে গুম করে। মামলা দেয়। এরা করে কি, ভিকটিমকে বলে, তুই ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে এসব বলবি, তাহলে দুই ১০-১৫ দিনেই বের হয়ে যাবি।

মানে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী দিতে বলে। অথচ এটা দেয়া মানে নিজের দোষ স্বীকার করা, এবং জামিন পেতে খুবই কঠিন হয়ে যায়। অনেকে পায় ই না। পিচ্চি পিচ্চি ছেলে পেলে ধরে এরা এসব করে। লোকে ফ্লেক্স করে মাদ্রাসার জনগী নেই। অথচ কত মাদ্রাসার ছেলেকে এরা এসব অকারণে ধরে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী নিয়ে নিজেদের টার্গেট ফুলফিল করছে। নতুবা তাদের বাপদের থেকে আসা পয়সা তো হালাল হচ্ছে না। এটা ওদের রুটিন ওয়ার্ক।

একবার এক ছেলের জন্য এক মহিলা অফিসারের খুব মায়া হলো। সে তাকে গোপেনে বললো, তুমি আগামীকাল ১৬৪ দিও না। কিন্তু ওই ছেলেও তবুও দিয়ে আসে। পরে সে বলে, সে তো ১৬৪ কি সেটা বুঝে নাই। ১৬৪ যে জবানবন্দি দেয়া এটা তো ওই অফিসার ডিটেইলস বলে নাই। বুঝেন কত নিরীহ একটা ছেলে।

আয়নাঘরনামা ০৭

প্রথম কিছু দিন মার খাওয়ার পর, ভাবলাম আলহামদুলিল্লাহ অনেক মার খাইসি - গুনাহ তো ইনশা'ল্লাহ কিছু মাফ হবে। কারণ এত পাপাচার নিয়ে মরতেও ভয় লাগে। বুঝতেই পারতেসেন। আমি কিছুদিন আগেই আব্বু সাথে ঝগড়া করেছিলাম। মাফও চাই নি। ঝগড়া লেজিট ছিল, কিন্তু তবুও আমার আচরণ লেজিট ছিল না।

আমি ভাবতাম, এখন কি করার আছে! মারটার খেয়ে তাও ভাবতাম যদি এগুলোর কারণে মাফ পাই। কিন্তু যতদিন গেলো, বাকি বন্দীদের কথাও ধীরে ধীরে জানতে পারলাম। তখন আমার মনে হলো যে, আমি তো এর কিছুই খাই নি। নখটখ উঠিয়ে কয়েকজনের অবস্থা একাকার। তারা খেতে পারেন না হাত দিয়ে, পরিষ্কার হতে পারেন না। তবুও সেভাবেই আছেন।

আমি ভাবতে থাকি ইশশ! আমার জন্যও কি সমানে এরকম অপেক্ষা করছে? যখন তারা আমাকে নিতে আসতো, হ্যান্ডকাফ খোলার শব্দ, মুখে কালো জম টুপি যেন আমরা কিছুই দেখতে না পাই - এসব চিন্তা করলেই - আমি শুধু ওজু করে বসে থাকতাম। ওরা আসলেই নামায পড়া শুরু করতাম। ভাগ্যিস পার্সোনাল টয়লেট ছিল। র্যাবের বাচ্চারা তো সেটাও প্রোভাইড করতো না।

আমার ঘটনা পুরো বললে আপনারা বিশ্বাস করতে পারবেন না। কিন্তু আমি যাদের দেখে এসেছি, তাদের ঘটনা আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারি না।

ওখানে কথা বলাও খুব কঠিন। আমার চারপাশে শুধু দেয়াল আর দেয়াল ছিল। মাঝে মাঝে প্রহরীরা আসলে মানুষ রূপী কিছু জানায়োর দেখতে পেতাম। রাতে ঘুম কমই হতো। কিন্তু হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে মনে হতো কবরে আছি।

আমরা থাকতে থাকতে দেয়াল দিয়ে কথা বলার পদ্ধতি বানিয়ে নিয়েছিলাম। যখন প্রহরীরা একটু ঢিল দিতো, বা একটু নরম প্রহরী পড়তো, আমরা কথা বলতাম। সেই সময়টার জন্য আমরা সারাদিন অপেক্ষা করতাম। কখনো মিলতো, কখনো মিলতো না। আহা কত সুখ-দুঃখের কথা। মাঝে মাঝে মিস করি সময়টা!

আয়নাঘরনামা ০৮

জম টুপি পরিয়ে আমাকে টানা হেচড়া করে হেডকোয়ার্টারে উপরে নিয়ে যায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিলো আমি নিশ্বাস নিতে পারছিলাম না। তাদের আমি বলতে ছিলাম আমি নিশ্বাস নিতে পারছি না তখন তারা উপরে উঠিয়ে ঐ টুপির একটু নাকের উপরে উঠিয়ে দেয় আমি তখন জোরে জোরে নিশ্বাস নিলাম

.

আমাকে একটা চেয়ারে বসালো মিনিট খানিক পর একজন এসে আমার কাঁধে থাপ্পর দিয়ে খুব রাগান্বিত ভাবে বললো নাম কি? আমি বললাম শামিম তার পর বললো এখানে কিভাবে আসলেন? আমি বললাম র‍্যাব ৯ সিলেট থেকে এখানে দিয়ে গেছে, উনি বললেন আচ্ছা।

.

এরপর কিছুক্ষণ পরে আবার আরেকজন এসে একই ভাবে একই কথা জিগ্যেস করলো এর পর থেকে প্রায় ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা আমাকে চেয়ারে বসিয়ে রাখে তখন সময় কত আমি জানি না তবে রাত ৮টা বা ৯ টা এমন হবে ,দুইজন এসে আমার দুই হাতে ধরে চেয়ার থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করতেছি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমার চোখ খুলে দেন। তারা আমাকে ধমক দিয়ে বলে চুপ থাক বেশি কথা বলবি না

.

সিঁড়ি দিয়ে নেমে সামনে একটি হাইলেক্সে উঠিয়ে ফেলে গাড়িতে বসিয়ে আমার মাথা কে গাড়ির সিটের নিচে নিচু করে রাখতে বলে কিছুক্ষণ গাড়ি চলার পর র‍্যাব ১ এর ভিতরে ডুকে (একটি কথা বলে নেই আমি তখন জানতাম না আমাকে কোথায় নিয়ে রাখা হচ্ছে)

.

গাড়ি থেকে নামিয়ে আমাকে ধরে সিড়ি দিয়ে উঠাচ্ছে তখন আমার পা আর সিড়ি ছারা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না সিড়িতে এত পোকামাকড় পড়ে আছে আর খুব বাজে গন্ধ ছিলো, সিড়ি দিয়ে তিন তলা পযন্ত উঠিয়ে একটি দরজার সামনে দাঁড়ায় ,একটি লোক দরজা খুলে দেয় দরজা টা লোহার ছিলো এর পর আরেকটি দরজা খুলে আমাকে সেল এরিয়ায় ডুকিয়ে আমাকে যেই সেলে রাখবে সেই সেলর তালা খুলে সেলে ডুকালো। এখানে জেনেরেটর ছাড়লে যেমন শব্দ হয় ঠিক এমন শব্দের একটা কিছু চলছে যেনো কারো চিতকার বা আওয়াজ বাহিরে না।

.

সেইলে ডুকিয়ে আমার হ্যান্ডকাফ খুলে দিলো আমাকে একটি ছেড়া গেঞ্জি আর খুব বাজে একটি লুঙ্গি দিয়ে বললো আপনার পাঞ্জাবি পায়জামা খুলে এই গুলা পরেন তখন চোখের কাপড় খুলে দেয় কিন্তু পিছনে তাকাতে কঠোর ভাবে নিষেধ চোখ খুলে যখন সেইলের দেয়ালে চোখ গেলো আমি এই প্রথম খুব ভয় পেয়ে যাই।

.

দেয়াল গুলাতে অনেক কিছু লিখা ছিলো কেউ লিখে রাখছে মা আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও , আল্লাহ আমাকে বাঁচাও কেউ আবার কত দিন যাবত এখানে আছে তা লিখে রাখছে আবার কেউ দাগ দিয়ে দিয়ে গননা করে রাখছে কতদিন যাবত এখানে আছে।

.

এর কারণ কয়েক দিন পড় আর টাইমিং মেলানো যায় না আজ কি বার কত তারিখ আর সময়ের হিসাব ছিলো না এখন টাইম কত, তারপর কাপড় খুলার পড় পুনরায় আমার চোখ বেঁধে আমাকে বের করে এখন আর তারা আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে না একজন লাঠি নিয়ে সেইলের লৌহাতে আওয়াজ করে বলছে সামনে আগান এর পড় বায়ে জান আবার সামনে যেতে থাকেন সামনে যেতে যেতে আমি দরজায় ধাক্কায় খেলাম এর জন্য ও সে আমায় শাসালো এর পড় আমার হ্যান্ডকাফ খুলে আমার পাঞ্জাবী আর পায়জামা হাতে দিয়ে বললো গোসল করে এই গুলা ধুয়ে নিয়ে আসুন।

.

আমি বললাম আমার কাপড় পরিস্কার এই গুলা ধোয়ার প্রয়োজন নেই সে আমাকে লাঠি দিয়ে একটি গুতা দিয়ে বললো যা বলছি তা কর।তাদের কথা মত গোসল শেষ করে সেইলে আসি আমাকে একটি কম্বল দিলো যেইটা বিছিয়ে ঘুমাবো ঐ কম্বল টা বিছিয়ে দেখি বড় করে একটা ক্রস চিহ্ন দেওয়া আমি এইটা দেখে ভয় পেয়ে যাই মনে অনেক রকম কথা আসে ,তারা আমার সাথে কি করতে যাচ্ছে তারা কি আমাকে ক্রস ফায়ার করে মেরে ফেলবে অনেক কিছুই মনে আসতে ছিলো। পরিবারের কথা বিবির কথা মনে হলে আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে যেতো তাদের কথা মনে হলে আমি ভেঙে পড়তাম আর তাদের সাথে আমার দেখা হবে না।

.

পড়ের দিন আমাকে আবার র‍্যাব হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যায় এইদিন ও আমাকে প্রায় ৪/৫ ঘন্টা বসিয়ে রাখে যেই রুমে আমাকে বসিয়ে রাখে এই রুমটা এত ভ:য়ংকর ছিলো কেউ না দেখলে বুজবে না রুমের দেওয়ালে ছিলো ভূতের মত ছবি চোখ উপরে ফেলা রক্তাক্ত ছবি মাথা ঝুলে আছে এমন ছবি , ইলুমিনিয়াতের সিম্বল ,ফাসির দরি, ইলেকট্রিক চেয়ার , লৌহার কাটা যুক্ত বড় প্লেট যার উপরে বসিয়ে রাখে।

.

৪/৫ ঘন্টা পড় আমাকে জিজ্ঞেসাবাদের জন্য কেউ আসে তারা আমাকে সিলেটের মহিউদ্দিন, তামিম আল আদনানী , মেজর জিয়া, আর ও নাম না জানা অনেকের কথা জানতে চায় , আমি বললাম আমি তাদের কাওকে চিনি না। তারা যা জানতে চায় তা না পেয়ে আমাকে অমানুষিক নির্যাতন করে ইলেকট্রিক সট থেকে শুরু করে ইচ্ছামতন পেটানো কিছুই বাদ রাখে নাই।

.

আমাকে আহত অবস্থায় রাতেই তারা কোথাও নিয়ে বের হয় আমাকে বলে তারা আমাকে মেরে ফেলবে বলেই বলে ,-আল্লাহ কে ডাক।

.

আমাকে আমাদের এলাকার একটা কবরস্হানের কাছে নিয়ে গাড়ি থামায়। আমি সেই দিন বুজে গেয়েছিলাম আমাকে তারা আজ এখন মেরে ফেলবে আমি ও আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর সাহায্যে অবিচল ছিলাম তওবা করে কালেমা পাঠ করে প্রস্তুত ছিলাম এইটা আমার শেষ সময় আর বাবা, মা স্ত্রী কাওকে দেখা হবে না। আমি তাদের কে আল্লাহর জিম্মায় ছেড়ে যাচ্ছি।

.

কিন্তু তাদের প্লান চেইঞ্জ হলো ঝালাকান্দী কবরস্থানের এখানে গাড়ি থামিয়ে যে প্রথমে বের হলো তার সামনে আরেকটি গাড়ি ছিলো সেই গাড়িতে বড় কোন অফিসার ছিলো

.

তার সাথে কথা বলে এসে দরজা লাগিয়ে বলবো মিশন কেন্সেল। এই বলে গাড়ি ছেরে দিলো আমাদের এলাকার দিকে তখন মনে হচ্ছিলো আমাকে ছেড়ে দিবে কিন্তু তারা আমাদের এলাকা থেকে আর একজন সাধারণ মুদি দোকানদার গোলাম কিবরিয়া নামের এক ভাইকে তার সদ্য বিবাহিত স্ত্রীর কাছ থেকে দরজা ভেঙে নিয়ে আসে উনার উপর তখন গোসল ফরজ ছিলো এমন অবস্থায় তাকে তুলে নিয়ে তারা আবার র‍্যাব ১ আয়না ঘরে ফিরে আস। আর লিখতে চাই না শেষ হবে না আর ও অনেক কিছু তারা করেছে।

.

যেইদিন আমাকে ও গোলাম কিবরিয়া ভাইকে তারা ছাড়ে সেই দিন আমাকে বলে এক অফিসার যে তোর ভাগ্য ভালো তোর বাবা মায়ের দোয়ায় আল্লাহ তরে বাচাইছে। এখান থেকে কেউ ফিরে যেতে পারে না তদের কে ছেড়ে দিচ্ছি কিন্তু যদি কিছু কখনো বলিস এই বিষয়ে তাহলে আবার তুলে আনবো। আমাকে যখন চোখ খুলে দেয় ১৪ দিন পড় আমি আলো দেখি আমি প্রায় ঘন্টা খানিক তাক্তে পারছিলাম না আস্তে-ধীরে সাভাবিক হয় আলহামদুলিল্লাহ।

.

এই পযন্ত শেষ করলাম আপনাদের দোয়া চাই আল্লাহ যেনো এই উম্মাহের জন্যে কোন খেদমতে আমায় কবুল করেন।

আয়নাঘরনামা ০৯

তখন সন্ধ্যা ৭টা...

হাসানাহ এর এডমিন আপনি?

- জ্বী। আপনারা কারা?

- গাড়িতে উঠেন। স্যার কথা বলবে।

- এখানে বলেন। কী সমস্যা!

- গাড়িতে ওঠ্। নাইলে গুলি খাবি।

ওঠার সাথে সাথেই হ্যান্ডকাফ। কালো কাপড়ে চোখ বেধে ফেলা।

- পাসওয়ার্ড দে ফেসবুকের।

- পাসওয়ার্ড তো মনে নাই। অটো লগইন হয়। রিসেট করে দিচ্ছি।

- জলদি কর।

কিছুদূর যাওয়ার পর।

- খিদা লাগসে। এই গাড়ি থামা। গ্রিল চিকেন আর রুটি ল। হুজুর দুইটার কাছে তোরা দুইজন থাক।

কিছুক্ষন থেমে গাড়ি চলতে শুরু করলো আবার। অজানা গন্তব্যে। কোথায় যাচ্ছি, কারা এরা? জানতাম না তখনো, কী ছিল আমার অপরাধ? সফওয়ানের কথা মনে পড়ছিল খুব। বাপের গা ঘেষে না শুলে ওর তো ঘুমই আসে না। আজ কিভাবে ঘুমাবে আমার ছোট্ট সফওয়ান!

আমাকে কি ক্রসফায়ারে দিয়ে দিবেন?

- আর একটা কথা বললে এখনই দিয়ে দিবো।

"এখনই দিয়ে দিবো" কথাটির অর্থ কি? তাহলে কি জায়গামত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

চোখ দিয়ে অবিরাম পানি ঝরছিল। খুব করোজরে বললাম,

হাসানাহর এডমিন হওয়াটা কি এত বড় অপরাধ। কিছু অভাবী অসহায় মানুষদেরকে আমরা সবাই মিলে সাহায্য করার চেষ্টা করতাম। এটা কি কোন ক্রাইম?

কোন উত্তর নেই দেখে বললাম,

আমার আম্মার সাথে একটু কথা বলতে দিন প্লিজ? উনি হার্টের রোগী। আমি যদি আজ বাসায় না ফিরি, আমার আম্মার কোন একটা অঘটন ঘটে যাবে। আমাকে এক মিনিটের জন্য একটা কল করতে দিন।

সাথে সাথে বন্দুকের বাটটা দিয়ে বাড়ি।

- তোরে বলসি একবার, চুপ থাকতে।

চুপ হয়ে গেলাম। গাড়ি চলতে লাগলো। আমার পাশে ছিল আমার সহকর্মী Sharif Malik ভাই। একসাথে বিকেলে বসুন্ধরা গেটে গিয়েছিলাম চা খেতে। আমাকে তুলে নিয়ে তাকে রেখে গেলে তিনি সব বলে দিতে পারেন। তাই তাকেও তুলে নেয়া হয়।

মোবাইল নিয়ে সুইচ অফ করে দেয়া হয়েছিল আরও আগেই। ঢাকা শহরের সীমানা পেরুতেই গাড়ি দ্রুত বেগে চলতে থাকে। আর তাদের মধ্যে শুরু হয় অশ্লিল কথোপোকথন।

রাস্তার পাশে কোন মহিলাকে দেখিয়ে তারা একজন আরেকজনকে বলতেসে, ঐ দেখ! তোর ভাবী যায়। তুলে নিবো নাকি?

অন্যজন বলতেসে- না, এটারে পছন্দ হয়নাই।

দুটো জলজ্যন্ত মানুষকে এভাবে তুলে নিয়ে এসেও কী অদ্ভুত ভাবে নির্বিকার ছিলেন তারা।

ঘন্টা দুয়েক গাড়ি চলার পর অবশেষে গাড়ি এসে থামে কোন একটি গেইটের সামনে। কিছুক্ষন অপেক্ষার পর গাড়ি থেকে নামিয়ে আনা হয়। চোখ বাধা, পায়ে জুতা নাই। গায়ে ছিল সেদিন অনেক জ্বর। হাটতে পারছিলাম না আমি।

দুজনে দুদিক থেকে ধরে করে নিয়ে ঢুকায় আমাকে। চোখের কাপড় সরানোর পর নিজেকে আবিষ্কার করি একটি ছোট ঘরে। শিক দেয়া ঘর। ১৪ শিকের জেলখানা।

খুব শীত লাগছিল। থরথর করে কাপছিলাম।

শুরু হলো এক লম্বা রাত।

বাকি ঘটনাটুকু লেখার আগে সংক্ষেপে একটু হাসানাহ সম্পর্কে বলে নেই। কেননা এই "হাসানাহ" র কারনেই এত জুলমের শিকার হওয়া। যারা হাসানাহ সম্পর্কে জানেন, তারাও পড়েন, কেননা শেষে একটা টুইস্ট আছে।

"হাসানাহ" বেসিকেলি খুবই সাধারন একটি ফেসবুক গ্রুপ। অসহায় অভাবী বা চিকিৎসা সহযোগিতা প্রয়োজন, এমন ভাই বোনদের হেল্প করার উদ্দেশেই এই গ্রুপটা খোলা হয়েছিল। হাসানাহর এই কাজ আমরা অনেক সময় নিজেদের ফেসবুক ওয়ালেও করে থাকি। নিজেদের পরিচিত কারো যদি ট্রিটমেন্টের জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন হয়, যা তার জন্য যোগাড় করা কঠিন, তাকে হেল্প করার জন্য আমরা আমাদের ওয়ালেই কিন্তু পোস্ট/ শেয়ার করে থাকি।

সেইম এই কাজটাই হাসানাহ গ্রুপে করা হতো। তবে, হাসানাহর একটি বিশেষ বৈশিষ্টও ছিল। তা হলো, এখানে যে কোন পোস্ট শেয়ার করার আগে সাহায্যপ্রার্থীর ব্যপারে খুব সতর্কতার সাথে যাচাই বাছাই করা হতো। যার কারনে, খুব অল্প সময়েই হাসানাহ সবার কাছে গ্রহনযোগ্যতা পেয়ে যায় যে, এখানে যাদের জন্য সাহায্য চাওয়া হয়ে থাকে, তারা প্রকৃতই অভাবী। তাই সবাই নিঃসংকোচে দান সদাকাহ করতো।

তো এই ভেরিফিকেশন প্রসেসের মধ্যে একবার একজন বাদ পড়ে গেলেন। যিনি ছিলেন সেই সময়কার ক্ষমতাবানদের একজন। তিনি তার এক আত্মীয়কে হেল্প করার জন্য আমাদেরকে চাপাচাপি করতে থাকেন। কিন্তু মেডিকেল টিমের কাছে যখন ডাক্তারি রিপোর্টসগুলো পাঠানো হয়, তারা বেশ কিছু গড়মিল দেখতে পান। যার ফলে পরবর্তীতে আমরা আর তার প্রজেক্টটা করি নি।

তিনি আমাকে দেখে নেয়ার হুমকি দেন। খুব স্পষ্ট ভাষায় বলেন

"তোদের সবগুলোরে এমনভাবে উধাও করে দিবো, লাশও পাবে না কেউ"....

ফিরে আসি ঘটনার ধারাবাহিকতায়....

জেলখানার সেই রাত। রাত ১২টার দিকে চোখ বেধে একটি রুমে নেয়া হয়। নাম ঠিকানা ব্যাংক একাউন্টস সহ সব ডিটেইলস নেয়। বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকে টেলিগ্রাম আইডি আছে কিনা। আমার কোন টেলিগ্রাম আইডি ছিল না। কিন্তু তারা সেটা বিশ্বাসই করছিল না। যাই হোক অনেকক্ষন পরে তারা আবার সেই কয়েদখানায় নিয়ে আসে।

এদিকে আমার বাসায় তখন তোলপাড় হয়ে গিয়েছে। মাদরাসা থেকেও ফেসবুকে নিখোজের সংবাদ জানানো হয়। অনেক ভাই বোন ফেসবুকে পোস্ট দেয়া শুরু করেন।

এসব দেখে রাত ৪টায় আবার ডেকে নেন। প্রচন্ড রাগান্বিতভাবে একজন ধমকাতে থাকে, ফেসবুকে এত হট্টগোল কেন হইতেসে?

কী আজব প্রশ্ন? আমার মোবাইল তারা তাদের গাড়িতে ওঠার পরই নিয়ে যায়। আমি তো কাউকে জানানোর সুযোগই পাই নি। সবাই চিন্তিত তাই পোস্ট দিচ্ছে, তাতে তো আমার কিছু করার নেই।

সন্দেহ হয় তাদের। আমার কাছে সম্ভবত আরেকটা মোবাইল আছে। যেটা দিয়ে আমি কাউকে হয়তো কিছু একটা জানিয়েছি। আবার বডি চেক করে। মিথ্যা বললে কি কি শাস্তি দেয়া হয়, তার একটা বিবরনও দেয়। মুখে কস্টটেপ লাগিয়ে পায়ের নখ তুলে ফেলবেন, যদি মিথ্যা বলি।

যাই হোক, ভয় দেখিয়েও কোন তথ্য তো পান নি। তবে তারা বিষয়টি নিয়ে কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েন। এদিকে বাসা থেকে উচ্চপদস্থ একজন পুলিশ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হয়। একজন অত্যন্ত সৎ মানুষ হিসেবেই আমরা তাকে চিনতাম। তিনি সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এতটুকু বলেন যে, যদি নিরাপরাধ হয়ে থাকে এবং তাকে rab / police এর কেউ নিয়ে থাকে, ইন শা আল্লাহ মুক্তির ব্যবস্থা করবো।

ফজরের কিছুক্ষন পর...

সিনিয়র দুজন অফিসার আসেন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। বেশ কয়েকজনের ছবি দেখিয়ে তাদের সাথে কতদিনের সম্পর্ক জানতে চাইলেন। তাদের কাউকেই আমি চিনতাম না। হা নিউজফিডে মাঝে মাঝে লেখা আসতো, সেই সুবাদে নামে চিনতাম।

এই মানুষগুলোকে তারা আগেই ধরে এনেছে এবং সবাই তাদের দৃষ্টিতে ভয়ানক জংগী(?)। বুঝলাম, আমাকে তাদের সাথে লিংকড করতে চাচ্ছে।

খুব স্পষ্ট ভাবে বললাম, আপনারা যদি আমাকে ফাসাতে চান, তাহলে যা খুশি করতে পারেন। তবে সত্যটা হলো, যাদের ব্যপারে জানতে চাচ্ছেন, তাদের ব্যপারে ভাল/মন্দ কিছুই আমি বলতে পারবো না। আমার সাথে তাদের কখনই কোন ধরনের কোন যোগাযোগ হয় নি। তারা কী ধরনের আকিদা বিশ্বাস লালন করেন, আমার জানা নেই।

শুরু হলো তারপর হাসানাহ নিয়ে। এটার মাধ্যমে জঙ্গি অর্থায়ন হয় বলে অনেকে নাকি অভিযোগ করেছে। অভিযোগ কে করেছে তা তো আর বুঝতে বাকি নেই।

বললাম, প্রমান যদি থাকে আমাকে দেখান। হাসানাহ থেকে যতগুলো প্রজেক্ট করা হয়েছে, তার প্রতিটার খুটিনাটি হিসাব আছে আমাদের কাছে। কাকে কখন কিভাবে কত টাকা দেয়া হয়েছে, সব। টেরোরিসমের জন্য ফান্ড রেইজ করা হয়, এটা প্রমান তো দুরের কথা, সন্দেহ করার মতও যদি কোন কিছু দেখাতে পারেন, যে কোন শাস্তি আমি মেনে নিবো।

এরপর সেই অফিসার আর কথা বাড়ালেন না। পুনরায় সেই বন্দিরুমে নিয়ে আসা হলো।

বিকেল তিনটা- সকালের সেই অফিসার এবার তার রুমে ডাকলেন। তার রুমটা ছিল অন্য আরেকটা বিল্ডিংয়ে। এবার চোখ না বেধেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। যাওয়ার সময় দেখলাম সেই পরিচিত দৃশ্য। যা আমরা রেগুলারই পত্রিকার পাতায় দেখতাম।

আলিম/দ্বীনদ্বার কাউকে দাড় করিয়ে, দুই দিকে দুজন র‍্যাব অস্ত্র হাতে... ছবি তোলা হয়। পরেরদিন পত্রিকায় আসে, অমুক এলাকা থেকে নিষিদ্ধ সংগঠনের অমুককে আটক করা হয়েছে।

এসবের সাথে আমি মোটেও অভ্যস্ত ছিলাম না। মানসিকভাবে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছিলাম না। মনে মনে ভাবছিলাম, এরকম মিথ্যা একটা অভিযোগ দিয়ে যদি পত্রিকায় আমার ছবি ছাপা হয়, আমার পরিবারের লোকজন বাকি জীবন কিভাবে মুখ দেখাবে। আমার বাবা তো নির্ঘাত স্ট্রোক করবে।

মনে মনে আল্লাহকে বললাম, আল্লাহ যদি আমার তোমার কাছে চলে যাওয়াটা কল্যানকর হয়, তুমি তাই করো। কিন্তু এই মিথ্যা অপবাদের বোঝা আমার পরিবারকে যেন বহন করতে না হয়। তারা এটা নিতে পারবে না।

যাই হোক এসব ভাবতে ভাবতে সেই অফিসারের রুমে গেলাম। অবাক হওয়ার পালা। তিনি এখন অনেকটা নরম সুরেই কথা বলছেন। জানালেন, তারা আমার দেয়া তথ্যগুলো ক্রসচেক করেছেন। আপত্তিকর কিছু পাননি। তাই আমাকে যেতে দিবেন। আমার বাবার সাথে ফোনেও কথা বলিয়ে দিলেন। পরে বুঝেছি অবশ্য, উপরোস্থ এমন কারো কল এসেছিল, যেটা তিনি আর ইগনোর করতে পারেন নি।

বিকেলের দিকে আমার বাবাকে ডাকলো তারা। মাদরাসা থেকে মুফতি তাইয়েব সাহেব (র) আসলেন। তাদের হাওয়ালায় আমাদেরকে মুক্তি দেয়া হলো। সহকর্মী যাকে আটক করা হয়েছিল, তার সাথে দেখা হলো এই ২৪ ঘন্টা পর। এখানে আনার পর তাকে কোথায় রাখা হয়েছিল, কোন খোজই পায় নি।

ছেড়ে দেয়ার সময় অনেকগুলো কাজ করলেন তারা -

আমার মোবাইলটা তারা রেখে দিলেন। মাত্র অল্প কয়েকদিন আগেই কেনা হয়েছিল।

ফেসবুক পাসওয়ার্ড তাদের কাছে থাকবে। পরিবর্তন করা যাবে না। চেন্জ যদি করি, তাহলে আবার ধরে নিয়ে আসবেন। এভাবে প্রায় ১ বছর পর্যন্ত পাসওয়ার্ড তাদের কাছে থাকে।

লিখিত দিতে হলো, হাসানাহ বন্ধ করে দিবো।

জুলুমের এই ২৪ ঘন্টার মাঝে মানসিক এবং শারিরিক অত্যাচারের আরও অনেক কিছুই ঘটেছে, স্কিপ করে গেলাম, লম্বা হয়ে যাচ্ছে দেখে।

বাসায় আসার একদিন পর আমরা সেই উচ্চপদস্থ অফিসারের বাসায় গেলাম। তিনি জানালেন, যদি কাল ছাড়া না পেতে, তাহলে পরেরদিন সকালেই তোমাকে কোর্টে চালান করে দেয়া হতো। পত্রিকায় নাম চলে আসতো। লাইফটা শেষ হয়ে যেতো। তখন আমিও কিছু করতে পারতাম না।

তারমানে, যাদের মামা-খালু নেই, তাদের ভাগ্যে কী ঘটতো?

২০২০ সালের এই ঘটনা হয়তো অনেকের কষ্টের কাহিনীর তুলনায় কিছুই না। তবে এই ছোট ঘটনা থেকে এতটুকু অনুমান ঠিকই করা যায় যে, কী পরিমান যুলুম আর অত্যাচারের স্টিমরোলার চালানো হয়েছিল তখন।

একটা মানুষকে বিনা কারনে কোন ধরনের কোন অপরাধ ছাড়া জঙ্গি সাজিয়ে কোর্টে চালান করে দেয়া হবে - এটা এতটাই সহজ একটা ব্যপার ছিল। তার নিজেকে ডিফেন্ড করার রাইট নাই। তার যুক্তি শোনার মত সময় নাই। তার আগেই সে জংগী। মাসকে মাস জেল খেটে বের হয়ে সেই পরিচিত মহল্লায় যখন ফেরত যায় সে, অনেক পরিচিত মুখই তখন অপরিচিত হয়ে যায়। বাকা চোখে তাকাতে থাকে নিজের আপনজনেরাও। “কিছু না করলে কি আর ধরসে” ....

যাই হোক, হাসানাহ এরপর বন্ধ হয়ে যায়। হাসপাতালের বিছানায় ক্যান্সারে আক্রান্ত সেই ছোট্ট আব্দুল্লাহকে বলেছিলাম, চাচ্চু! তুমি খুব তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবা ইন শা আল্লাহ। তার বাবাকে আশ্বাস দিয়েছিলাম, ইন শা আল্লাহ আপনার ছেলের চিকিৎসার সমস্ত খরচের ব্যবস্থা আমরা করবো, আপনি টেনশন করেননা।

বাসায় ফেরার পর আব্দুল্লাহর বাবা অনেকবার ফোন দিয়েছিলেন। তার ফোন ধরে কিছু বলার মত ভাষা আর ছিল না। অবশেষে ৬ মাস পর আব্দুল্লাহ মারা যায়।

মাফ করে দিস আমাকে, চাচ্চু!

আয়নাঘরনামা ১০

২০২১ সালের ২০ ডিসেম্বর আমাকে সিটিটিসি গুম করে। শুরুতে তারা আমার অফিসে এরে রেকি করে যায়। বলে রাখা ভালো যে, সেটা আমার মূল কর্মস্থল ছিল না। আমি ফোনে একজনকে কনফার্ম করেছিলাম যে সেদিন আমি সেই শাখায় থাকবো। তো তারা সেদিন সেই সময়টাতে আসে, এবং আমাকে পায় এবং অফিস থেকেই তুলে নিয়ে আসে। আসার সময় অফিসের সিসিটিভির ফুটেজ সহ পুরো ড্রাইভটাই খুলে নিয়ে আসে, যেন কোন প্রমাণ না থাকে। তারা আমার সাথে থাকা টাকা-পয়সা এবং ডিভাইসগুলোও নিয়ে যায়, সেগুলোর হাদিস আমি আর পাই নি।

তারা প্রথম ১০ দিন আমাকে অমানসিক নির্যাতন করে। আমাকে জম টুপি পরিয়ে হাত টাই হ্যান্ডকাফ পরিয়ে, ইচ্ছামত পেটানো হত। তারপর বিভিন্ন লোকের ছবি দেখানো হত, যাদেরকে আমি চিনি না। আমি চিনি না বললে, আবার আরেক দফা পেটানো হতো। আমাকে বলা হয়েছিল, আমাকে তারা ক্রসফায়ার দিবে। আমার লাশও কেউ নিতে আসবে না। আমার জন্য আমার ফ্যামিলি সমাজচ্যুত হবে। আমি কি এসব চাই কিনা? তাদের কি সেই সক্ষমতা আছে কিনা।

তারা আমকে সিটিটিসি কম্পাউন্ডের ৭ তলার সেলগুলোতে রাখো, যেখানে মোট ১২ টা সেল ছিল। আমাকে শীতকালে বন্দি করা হয়েছিল যেহেতু, প্রতি রাতে ঠান্ডায় পিঠে ফেলে রেখে শুইতে খুব কষ্ট হতো। খুবই নিম্ন মানের খাবার যেন কারো বাসি করা খাবার আমাদের দেয়া হয়েছে। পঁচা মাছ, বুড়া-শক্ত সবজী দেয়া হত। আমরা অনেক অভিযোগ করার পর ডিম ভাজি দিত কিন্তু সেটা এত নষ্ট তেলে ভাজা য়ে, সেটা খেলেই পেটে ব্যাথা কুকড়ে যেতাম। যেই বাটিতে করে খাবার দেয়া হতো, সেটার দূর্গন্ধ মাঝে মাঝে এত বেশী হতো যে, সেটা সহ্য করানিজের বমি নিজে খাওয়াটও সম্ভবত এর চেয়ে সহজ হতো

আমাদেরকে কলের পানি খেতে বলা হত। মাসের পর মাস ডিরেক্ট কলের পানি খাওয়াটা নিশ্চয়ই ক্ষতিকর, আপনারা তা জানেম। কিছু কিছু কন্সটেবল যারা পাহারা দিতে আসতো, তারা খুব বাজে গালাগালি করতো। আমরা একটু ঘুমাতে চাইলে নিশ্চিন্তে অনেকে বাজে মন্তব্য করতো যে, কেনো আমাদের চেহারায় দুশ্চিন্তা নেই, কেনো আমারা নির্ভার ঘুমাচ্ছি। আমরা মাসের পর মাস সূর্য্যের আলো দেখতাম না। আমাদের বন্দীদের মধ্যে কথা বলাও নিষেধ হত। আমরা একটু কথা বলার জন্য সারাদিন অপেক্ষা করে থাকতাম য়ে, কখন সুযোগ পাওয়া যায়।

জিজ্ঞাসাবাদের সময়, তারা ইসলামের বিভিন্ন নিয়ম, খলিফাদের চরিত্র নিয়ে বাজে কথা বলতো, হাসাহাসি করতো। বিভিন্ন সম্মানিত ব্যক্তিদের নামে অশালীন অপবাদ দিত। এবং তাদের অনেকেই ফোন ট্যাপ করার হাতিয়ার পেয়ে এসব অনেক অনৈতিক কাজে ব্যবহার করতো। অনেকে প্রকাশ্যে আমাদের সামনে ফোনে পরিকায়া করতো, যেটা তাদের কথোপকথন দেখলেই বুঝা যায়।

একটা পর্যায়ে তারা বলতো, আমি না হয় ভালো বা কোন অপরাধ করি নি। কিন্তু আমার কাছে এরকম কাকে সন্দেহজনক মনে হয় তাদের নাম-ঠিকানা পরিচয় দিতে। কিংবা আমার পরিচিতদের নাম-ঠিকানা-পরিচায় তাদের লিখে দিতে হত। তারপর নিজের জীবন কাহিনী লিখতে হত। একবার না, কয়েকবার করে লিখতে হতো। এরপর মাসের পর মাস ফেলে রাখতো। আর মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসাবাদ করতো - সেই আগের প্রশ্ন, আগের ছবি। প্রতিবারের মত যে, তুই কাউকে দেয়, তোকে ছেড়ে দিবো। যদিও এটা পুরো মিথ্যা কথা, বছরের পর বছর ফেলে রাখার হুমকি দিতো। একটা পর্যায়ে বাধ্য হয়েছি, প্লিজ আমাকে ক্রস ফায়ার দিয়ে দিন, নতুবা অন্তত মামলা দিন - পরিআআর অন্তত জানুক।

তারা বিভিন্ন পরিচিত মানুষের নামে মিথ্যা কথা বলতো যে, সে তো এমন এমন - এত খারাপ - তুই তাকে ধরিয়ে দে। প্রথম প্রথম ট্রমার চোটে তাদের এই চালাকিগুলোতে ঠিকমত ধরতে না পারলেও, ধীরে ধীরে বুঝতে পারি এগুলো তারা আমাকে ম্যানুপুলেট কার জন্য বলছে। কারণ টেকনোলজি সম্পর্কে জ্ঞান থাকায় কিংবাআ আমার জেনারেশন কিভাবে চিন্তা করে, কাজ করে এগুলোর ব্যাপারে ধারণা ছিল। তাই তাদের প্রতারণাগুলো সহজেই ধরতে পারছিলাম।

৫ মাস এভাবে চললো। এরপর ৫৬ দিন আমার সেলের তালা খোলা হয় নি। ২০৯ দিনের দিন আমার নামে মিথ্যা নশকতার মামালা দেয়া হয়। এবং পরের দিন ম্যাজিস্ট্রেটের সমানে নিজেদের উপর আনা অভিযোগ

স্বীকার করতে বলা হয়। তারা বলে যে, এমনটা করলে আমাদের মামলা সহজ হয়ে যাবে। আমার ১০-১৫ দিনের মধ্যে বের হয়ে যাবো। অথচ এটাও এই দাজ্জালদের মিথ্যা কথা। কারণ ১৬৪ ধরায় নিজেদর উএর আনা অভিযোগ স্বীকার করে জবানবন্দি দিলে সেই মামলা থেকে জামীন পাওয়া এবং পরবর্তীতে মামলা থেকে খালাস পাওয়া খুব কঠিন হয়ে যায়। এটা জানা থাকায় আমি বা আমার সাথে যাদের কেইস পার্টনার দেয়া হয়েছে, তারা কোর্টে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেই নি।

এরপর আমাদের প্রথমে কেরানীগঞ্জ এবং এরপর কাশিমপুরে পাঠানো হয়। এরপর আবার আমাদের রিমান্ডে নেয়া হয়। আরেক দফা ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিতে রাজি করানো হয়। এবারও আমার তা দেই নি। এবং এতদিনেও আমার পরিবার জানতো না যে, আমি কই আছি। তখন তাদের জানানো হয়, এবং তাদেরকে ডেকে নিয়ে আমার নামে বিভিন্ন ভুল জিনিস বুঝানো হয়। তারা বুঝায় যে তারা আমার উপকার করেছে, নতুবা আমার আরো ক্ষতি হত। তারা নাকি ইহসান করেছে।

এরপর আমি কাশিমপুরে আরো ১০ মাস কাটাই। সেখানে জেল সুপার সে আমাদের শীতকালে কম্বল, মশারী এসব ব্যবহার করতে দিত না। কিছুদিন পর পর এসে আমাদের জিনিসপত্র সব চেকিং এর নামে লন্ডভন্ড করে দিতো। ১০ মাস পর আমার জামীন হলেও আমাকে তার বের হতে দিচ্ছিল না। ১৪ দিন পর আমি বের হতে পারি। চিন্তা করুন জামীনের পর আরো ১৪ দিন জেল খাটতে হয়েছে। এসময়ে বিভিন্ন সংস্থা এসে আমার তথ্য নিয়ে গেছে, আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে গেছে।

আয়নাঘরনামা ১১

"স্মৃতির পাতা থেকে আয়নাঘর"

১১ জানুয়ারি, ২০২০, শনিবার। ঢাকার উদ্দেশ্য বের হচ্ছি, আম্মার চোখে পানি। বাসার সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমার চোখেও পানি এসে গেলো। আম্মার সামনে শক্ত থাকার চেষ্টা করেছি, নয়তো হাউমাউ করে কেঁদে দিতো।

কাল আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরু, ওরিয়েন্টেশন। সামনে অনার্স লাইফ, চাকরি-বাকরি, হয়তো আর পার্মানেন্টলি বাসায় আসা হবে না। এলেও অতিথি হিসেবে। সকালবেলা হাজীগঞ্জ বাজার থেকে বাসে উঠলাম। কাঁচপুর ব্রিজে পৌঁছালে আম্মা কল দেয়। কল রিসিভ করে বলি ঘন্টাখানেক লাগতে পারে। নেমে কল দিব ইনশাআল্লাহ।

যাত্রাবাড়ী মোড়ে নেমে হালকা নাস্তা করলাম। যাব মিরপুর, আমার ফুফাতো বোনের বাসায়। কিছুদিন আপাতত থেকে তারপর দেখেশুনে মেসে উঠবো, এই হলো চিন্তা।

হোটেল থেকে নেমে মাত্র এক দু কদম হাঁটলাম, তখন ভরদুপুর। হুট করে পাঞ্জাবি পরিহিত একজন সামনে এসে আমার নাম ফয়েজ কিনা জিজ্ঞেস করলো। হ্যাঁ বললাম। বলে আমাদের সাথে একটু যেতে হবে। সাহস করে বললাম আপনারা কারা? বলে 'আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী'।

বললাম 'কোনো পোশাক নেই, আইডি কার্ড নেই। আর এভাবে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

বলে 'গেলেই দেখতে পাবেন'।

আর অমনি শক্ত করে জাপটে ধরে কাছের এক জিপগাড়িতে উঠালো। মুহুর্তেই মধ্যেই দুই হাত পেছনে দিয়ে হ্যান্ডকাফ পড়ালো। চোখ বাঁধলো, তার উপর জমটুপি:গলা অবধি ঢেকে যায় যার, তার উপর আবার চোখ বাঁধলো। সাথে থাকা মোবাইল ফোন নিয়ে গেলো। কিছু বুঝে উঠার আগেই এতসব ঘটে গেলো।

অনুরোধ করলাম, আম্মাকে একটু কল দিয়ে বলি অন্তত ঢাকা পৌঁছেছি, নয়তো চিন্তা করবে। অনুরোধ রাখলো না। রাখবে কেন? মায়ের কান্না, মায়ের আকুতি ওরা কী বুঝবে!

হাই বিটের গান ছেড়ে দিলো গাড়িতে, যেন আশেপাশের আওয়াজ কানে না যায়। একই রাস্তায় কয়েকবার যাচ্ছে এমন মনে হচ্ছে, গোলকধাঁধার মতো। এভাবে ঘন্টাখানেক পর গাড়ি থামলো। কিছুক্ষন পরে নিয়ে গেল ইন্টারোগেশন রুমে। এয়ার ফ্রেশনারের ঝাঁঝালো ঘ্রাণ। মাথার ঠিক উপরে দেয়াল ঘড়ি, চারপাশ নিস্তব্ধ, ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ মগজে গিয়ে ঠেকছে।

দুর্বিষহ দিনের শুরু, পালা করে জিজ্ঞাসাবাদ আর নির্মম মাইর। এত নির্মমভাবে মানুষকে মারে? শরীরের হাড্ডি-মাংস যেন এক হয়ে যায়।

সেদিনের মতো ইন্টারোগেশন শেষ! হ্যান্ডকাফ খুললো, পোশাক পালটে নতুন পোশাক দিল, চোখ তখনও বাঁধা।

নিস্তেজ শরীর দুজন মিলে ধরে দিয়ে আসলো এক সেলে। সারাদিনে ঐ প্রথম চোখের বাঁধন খুললো। কিন্তু বুঝার উপায় নেই কোথায় আছি।

ছোট্ট রুম, লম্বাটে শেইপ, একপাশে একটা খাট পাতা। পুরো রুমে ছাদের সাথে লাগোয়া একটা ছোট্ট জানালা, দেখার উপায় নেই বাইরে কী হচ্ছে। দরজায় ডাবল লেয়ার। একটা জেলখানার মতো শিক, সাথেই লাগোয়া আরেকটা কাঠের দরজা, মাঝখানে একটু ছিদ্র, সেটাও বন্ধ থাকে, ভেতর থেকে খোলার উপায় নেই। দরজার নিচের দিকে ছোট্ট একটা জায়গা, খাবার এদিক দিয়ে দেয়। খুজছিলাম কোথাও কোনো ক্লু পাই কি না, দেয়াল এবড়োখেবড়ো, লেখার সুযোগ নেই কোনো। রুমের এক কোনায় অত্যাধুনিক সিসি ক্যামেরা।

বিশাল বড় এগজস্ট ফ্যান, বাইরের শব্দ যেন কানে না এসে, যেন অনুমানও না করা যায় কোথায় আছি। এত জোরে আওয়াজ করে ঘুরতো যেন জেট বিমান যাচ্ছে, তখন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ছিলো, মাইকিং হতো, তাই প্রায় সারাদিনই চলতো।

মনে হতো একটা কবরের মধ্যে আছি। আমি একা, আর কেউ নেই। বাইরের মানুষের কাছে হয়তো আমি মৃত, কিন্তু আমি জানি আমি জীবিত, জীবন্মৃত। মুনকার নাকির(!) প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে, সন্তোষজনক উত্তর না দিলে নির্মম অত্যাচার।

বাড়ির কথা খুব মনে পড়তো। আম্মার সাথে কবে রাগ দেখিয়েছি, আব্বার কোন কোন কথা শুনিনি, ভাইয়ার সাথে কবে মারামারি করেছি, পিচ্চি ৩টা ভাগ্নে-ভাগ্নি ছিলো। আল্লাহ.....।

আম্মা খুব কান্না করছে এটা মনে হতো। বড় মামা মারা গিয়েছে একমাসও হয়নি, এর উপর আমার হারিয়ে যাওয়া.....এভাবে প্রায় প্রতিদিনই জিজ্ঞাসাবাদের নামে চলে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। রাতে একটু আরাম করে ঘুমাবো, সেই সুযোগ নেই। সারা শরীর ব্যাথা। খাবার যা দেয় গলা দিয়ে নামে না। বেঁচে থাকার জন্য খাওয়া, টিকে থাকার জন্য খাওয়া।

পাশের সেলে মানুষের উপস্থিতি টের পেতাম, কিন্তু কথা বলার সুযোগ নেই। গার্ড থাকে সবসময়। এক ভাই প্রায় সারাদিনই কান্নাকাটি করতো, চিৎকার করতো, আল্লাহ জানেন উনার উপর দিয়ে কি গিয়েছে।

১০/১২ দিন পর অন্য আরেকটা রুমে পাঠায়। একটু পুরনো ধাচের। কিছুটা মসৃণ দেয়াল।

দেয়ালের এখানে সেখানে আলতো করে খোদাই করা অনেক লেখা। একেক রকম হাতের লেখা। কত শত মজলুমের স্মৃতি। কেউ আল্লাহর কাছে বিচার দিচ্ছেন, কেউ মুক্তির দু'আ করছেন। এক জায়গায় অনেকগুলো দাগ কাটা, কতদিন এখানে ছিলেন তার হিসাব, এক দেয়াল ভরে গিয়ে পরের লাইনে এসেছে, দাগ কাটা শেষ হয়না।

সবরকম নির্যাতনের ব্যবস্থাই ছিলো। একেক জনের সাথে একেক রকম নির্যাতন। ওয়াটার বোর্ডিং, ইলেকট্রিক শক, বাঁশ ডলা, ছাদের সাথে ঝুলিয়ে পেটানো....নক উপরে ফেলা, আরো কতো কি!

এভাবে ৪২ দিন পার হয়। অতঃপর আমাকে বলা হলো আমি আমার পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারব। তবে..... আমাকে আইনী প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে।

প্রসঙ্গিত, আয়নাঘর থেকে কাউকে এমনি এমনি ছেড়ে দেয়া হয়না। হয় ক্রসফায়ার দেয়া হয়, নয়তো মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে ভরে, যেন বের হয়ে মুখ খোলার সাহস না করে। তারা নিজেরা কখনও মামলা দেয় না, সাধারণত র‍্যাবের মাধ্যমে দেয়।

আমাকে হাত চোখ বেঁধে গাড়িতে তোলা হয়, শুরু হয় আরেক আয়নাঘরের জীবন। এখানে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সবমিলিয়ে ২দিন। জিজ্ঞেস না করে পশুর মতো পেটানো যার উদ্দেশ্য। এখানে যেই রুমে ছিলাম সেটা বেশ বড়োসড়ো, ঘুটঘুটে অন্ধকার। পুরনো বিল্ডিং, জায়গায় জায়গায় ভাঙ্গা, মেঝে-দেয়ালে-ছাদে।

মাঝে করিডোর, সেখানে কিছু লাইট জ্বলে, দুপাশে ৫টা করে মোট ১০টা রুম। পালাকরে ওয়াশরুমে নিতো, কাছাকাছি রুম হওয়ায় অনুমান করেছিলাম, মোট ১০ বার তালা খুলতো আর লাগাতো।

সবচেয়ে নির্মম ব্যাপার কি জানেন?

২৪ ঘন্টা চোখ বেঁধে রাখতো, এমনকি রুমের মধ্যেও। সূর্যের আলো দূরে থাক, আলো দেখারই সুযোগ নেই। গার্ড না থাকলে মাঝে মাঝে চোখের নিচ দিয়ে আশেপাশে দেখতে চাইতাম। আমার চশমার পাওয়ার -3.50, একটু দূরেই ঝাপসা দেখি, তাই খুব একটা লাভ হয়নি। ২৪ ঘন্টা হাতে হ্যান্ডকাফ পরা থাকতো। রাত ৯টা থেকে রাত ৩টা পর্যন্ত দুহাত পেছনে দিয়ে হ্যান্ডকাফ দিতো। রাতে যে একটু ঘুমাবো সেই সুযোগ নেই। কিচ্ছুক্ষণ বসে দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে, কিছুক্ষণ উপুড় হয়ে...। কত জঘন্য।

ওয়াশরুমে গেলে শুধু একহাতেরটা খুলতো।

হাতে দাগ পড়ে গিয়েছিলো এভাবে।

মেঝেতে একটা কম্বল বিছানো ছিল। এত নোংরা, এর উপর উঠলেই শরীরে চুল্কানি হয়। বাধ্য হয়ে মেঝেতে ঘুমাতাম। উপুড় হয়ে দুই হাত পেছনে রেখে মেঝেতে ঘুমাতে কেমন লাগতো!?

এক গার্ড ছিলো একটু ভালো, অনেক অনুরোধ করলাম অন্তত এটা বলুক জায়গাটা কোথায়। বললো র‍্যাব ১।

টানা ৩০দিন এভাবে ছিলাম।

অতঃপর আমাকে নতুন আরেক জায়গায় নিয়ে গেলো। আয়নাঘর নং ৩। সেখানে এক রাত ছিলাম। একদম ছোট একটা রুম, রুমের মধ্যেই কমোড, ঠিকমতো ঘুমালে কমোডে পা চলে যায়, পাশে সর্বোচ্চ ২ হাত প্রশস্ত।

সে রাতেই এসে পাঞ্জাবির মাপ জানতে চাইলো।

চিন্তায় ঘুম হয়নি আর।

পরদিন সন্ধ্যার দিকে রঙচঙে এক পাঞ্জাবি নিয়ে আসলো, সাথে একটা ট্রাউজার। দ্রুত পরে নিতে বললো।

অতঃপর চোখ বাঁধলো, পেছনে দুই হাত দিয়ে হ্যান্ডকাফ, মাথায় হ্যালমেট। একটা গাড়িতে উঠালে, অনুভব করলাম আমার মতো আরো দুইজনকে উঠালো।

একজন গাড়ি থামিয়ে তারা নিজেরা নামলো।

- ঐ গাড়ি চেক কর, সাবধান ভেতরে অস্ত থাকতে পারে।

- স্যার অস্ত্র নাই, উগ্রবাদী বই পাইসি।

কিছুক্ষণ হট্টগোল, তারপর আবার গাড়ি চললো।

নিয়ে এলো র‍্যাব ৩ এ, প্রথমবারের মতো চোখের বাঁধন খুললো। গারদে আমার সাথে আরো ২জন ঢুকলো। মোট ৩জন। নাটকের উদ্দেশ্য মিথ্যা মামলা সাজাবে, এখন বুঝলাম সব। ডেকে নিয়ে ছবি তুললো, সামনে কিছু

বই-মোবাইল এসব সাজানো, এগুলো নাকি আমাদের কাছে পাওয়া গিয়েছে, অথচ এসবের নামও কখনো শুনিনি।

আর আমার কাছে এসব থাকবে কেনো। পরদিন ওরিয়েন্টেশন, ব্যাগে জামা কাপড় আর একাডেমিক কাগজপত্র ছিলো। মিথ্যার তো একটা সীমা থাকা উচিত।

এজহারে যা লিখলো.... তার সারমর্ম হলো: "আমরা ২৩মার্চ ২০২০, রাত ৮টার দিকে মতিঝিল মডেল হাইস্কুলের মেইন গেইটের পূর্বপাশে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনের সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করার জন্য রাজধানী ঢাকাসহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করছিলাম। সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করাকালে তারা আমাদের ধাওয়া করে, ৩জনকে আটক করতে সক্ষম হয়, বাকি ৮/১০ পালিয়ে যায়। নিষিদ্ধ বইগুলো আমাদের সাথে থাকা ব্যাগে ছিলো"

পরদিন মতিঝিল থানায় নিলো, মামলা দায়ের করলো, এমন কোনো ধারা নেই যে দেয়নি, যেন ১/২ বছরেও বের না হতে পারি।

বাড়িতে কল করতে দিলো। আব্বা আম্মা আর ভাইয়া আসলো। থানার গারদে সেদিন অনেক কেঁদেছিলাম উনাদের জড়িয়ে ধরে.....

সবমিলিয়ে প্রায় ৭৭০ দিন পর আমার জামিন হয়। সে এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা, অন্য এক পোস্টে বলবো ইনশাআল্লাহ....

এখনও মামলা চলমান, হাজিরা দিতে হয় মাসে মাসে। ২বছরে ১টা স্বাক্ষীও আসেনি। আসবে কীভাবে? ঐযে গাড়ি থামিয়েছিলো, সেখানকার আশেপাশের পথচারী, রিকশাওয়ালা, ঝালমুড়ি ওয়ালাকে ভয়ভীতি দেখিতে মিথ্যা স্বাক্ষী বানিয়েছে...।

--

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে...

"আপনাকে কেন ধরবে?"

"কিছু তো অবশ্যই ছিলো..."

আমি নটরডেমে কলেজে পড়া অবস্থায় আরামবাগে থাকতাম। সেখানে আরামবাগ মোড়ের বাইতুল আমান মসজিদে এক ভাই আরবী পড়াতেন। সব বয়সের স্টুডেন্ট ছিলো উনার, স্কুল কলেজ পড়ুয়া থেকে অবসরপ্রাপ্ত চাকুরীজীবি পর্যন্ত। মসজিদের লাইব্রেরিতে পড়াতেন বেশিরভাগ, নয়তো বারান্দায়। প্রকাশ্যে, সবার সামনে, সবাই জানতো। লুকোচুরি কিছু না। মসজিদের ইমাম থেকে মসজিদ কমিটি সবাই জানতো। কমিটির অনেকে উনার কাছে পড়েছে।

আমি উনার কাছে কিছুদিন পড়েছিলাম।

আমাকে গুম করার প্রায় ২মাস আগে উনাকেও গুম করে। পরবর্তীতে উনাকেও মিথ্যা মামলা দিয়ে ছেড়ে দেয়। জিজ্ঞাসাবাদের ধরন দেখে ধারণা করছি এই সূত্র ধরেই হয়তো আমাকেও গুম করে। পরবর্তীতে শোনা যায়, উনি গুম হওয়ার কিছুদিন পূর্বে মসজিদ কমিটির সাথে উনার কী একটা ঝামেলা হয়েছিলো।

মামলার এজহারেও আরবী শেখার কথা তারা লিখেছিলো। তবে লিখেছে আরবী শেখার নামে জ-ঙ্গিবাদের ট্রেইনিং নিতো।

নতুন বাংলাদেশে এসব থেকে মুক্তি পাব কী?

মামলা থেকে অব্যাহতি মিলবে কী?

আমার জীবনের আড়াই বছর কি তারা ফিরিয়ে দিতে পারবে কখনও?

আয়নাঘরনামা ১২

আজকে আমার গুম সময়ের সবচাইতে এক্সাইটিং ঘটনার কথা বলবো।

এটা হচ্ছে মিন্টু রোডের সিটিটিসির ৭ তলা। আমি ছিলাম ৫ নং সেলটাতে। তো কোনা দিয়ে গার্ডদের একটু দেখা যায়। দিনটা ছিল ২০২২ এর কুরবানীর ঈদের পরের প্রথম জুমা বার। গার্ডে ছিল এক বয়স্ক কন্সটেবল। তার আবার দাড়ি আছে নামায পড়ে। ঘুম ভাঙার পর আমি বুঝতে পারছিলাম না যে, আযান হয়েছে কিনা। আমি চিন্তা করলাম কন্সটেবল যদি নামাযে দাড়ায় তাহলে আযায়ন হয়োছে, ধরে নিয়ে আমি ফজর পড়ে ফেলবো। কিন্তু কন্সটেবল তো আর নামাযে দাড়ায় না। সে একবার এদিকে আরেকবার ওইদিকে হন্ত দন্ত হয়ে হাটাহাটি করছে। আবার এসে সুইচ অফ করছে, নিভাচ্ছে।

আমি আর অপেক্ষা না করে ওযু করে নামাযে দাড়িয়ে গেলাম। কিন্তু নামায শেষ হতে না হতেই মোটামুটি শোরগল পড়ে গেলো যে, ২ নং সেলের বন্দী নাকি নেই। বাকিরা বলছে, এই ভাইটা মজা করে অনেক সময়ই। হয়ত টয়লেটের দেয়ালের পিছনে লুকিয়ে বসে আছেন। কেউ কেউ বললো ভাই, এনাফ মজা হইসে, বের হয়ে আসেন। আবার কেউ কেউ বললো, টয়লেটে অসুস্থ্য হয়ো অজ্ঞান-টজ্ঞান হলো কিনা। আমার বললাম যেটাই হোক, চাবি খুলে দেখা হোক যে কি হয়েছে।

পরে ৬ নং সেলের ভাইটা বলে, ভাই চাবি দিয়ে তো খুলতে পারতেসে না। আবার একেবারে বাহিরের গেটও আটকানো। কোন চাবি দিয়ে খুলতেসে না। সে জন্য সে ওজু করতে বাহিরেও যেতে পারছে না। চাবির তোড়ায় দুইটা চাবি কম। অর্থাৎ ২ নং সেলের বন্দী পালিয়ে গিয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো কিভাবে পালালো?

বলে রাখা ভালো যে, গার্ড দেয়ার নিয়ম মূলত ২ জনের। দিনে ১২ ঘন্টা করে করে শিফট। তো ওই রাতে আরেক এএসআই গার্ড ফাঁকি দিয়ে বাসায় চলে গেছে। এর আগের রাতে ওই ফাজিল এএসআই গার্ডটা বয়স্ক গার্ডটারে দেখে বলে, আরে নানা - আইজকা তুমি জানলে তো আমি বাসাত থেয়েই বাহির হইতাম না। সেখানে ফোন ইউস করা নিষেধ হলেও, গার্ডরা লুকিয়ে নিয়ে আসতো্। তো বয়স্ক গার্ডটা লুকোনো স্থান থেকে ফোন বের করে ওই ফাঁকিবাজ গার্ডটাকে ডাকলো, এবং বাকি কর্তৃপক্ষকে ঘটনা জানালো। ফাঁকিবাজটা তো এসে আর ঢুকতে পারে না। ততক্ষণে অফিসররা এসে পড়েছে। এসে দেখে ফাকিবাজটা বাহিরে। অর্থাৎ সে ডিউটিতে থাকলে তো তারও বন্দী থাকার কথা ছিল, কারণ পলাতক বন্দী গার্ডদেরও তালা মেরে চলে গিয়েছিল। তারপর ইনজার্চ অফিসার - এটা আরেক বদমাইশ এসে বলে যে, যদি সবগুলার লক খুলে দিত, তাহলে কি হত!!

সকাল পেরোতে না পেরোতে শুরু হল আমাদের উপর হাস্যকর নির্যাতনের স্টিম রোলার। তারা আমাদের বালিশ কম্বল, জামা, পায়জামা সব নিয়ে নিল - আর অকথ্য গালাগালি। আমি গোসল করছিলাম, সেই মূহুর্তে এসে আমার বাকি জামা কাপড় নিয়ে গেলো। আমি পরে অনুরোধ করো এক জোড়া রাখতে পারি। ৪ নং সেলের বন্দী বলে আমার পরনের পায়জামাটাও নিয়ে যাও। দরকার নেই। এর পর থেকে নিয়ম হল, কন্সেটবলরা তাদের গার্ডের জায়গায় শুয়ে ঘুমাতে পারবে না। তাদের দাড়িয়ে বা বসে থাকতে হবে। ইনচার্জ অফিসার তাদেরকে সহ মেইনগেট তালা দিয়ে চলে যাবে। ১২ ঘন্টা ডিউটি শেষ হলে তালা খোলা হবে, ডিউটি চেইঞ্জ হবে, যেন ফাকি দিতে না পারে।

তো কিভাবে ২নং সেলের বন্দী পালালো?

বলে রাখা ভালো যে, এটা তার প্রথমবার পলায়ন নয়, বরং দ্বিতীয়বার। ওই বন্দী শুরুতে ৪ নং সেলে ছিল। তখন গার্ড থাকতো ১ জন। তো একরাতে ৪ নং সেলের লোহার কল খুলে, আগেরকার কালো তালাগুলো দিয়ে লক ছিল, সেটার মাধ্যমে তালা ভেঙে ফেলে। এবং কম্বল সাথে করে নিয়ে সিড়ির ঘরের জানলা দিয়ে কম্বলকে রশি বানিয়ে পালিয়ে যায়। পরে তাকে আবার আটক করার হয়। আটকের সময় এক ইয়া বিশাল গরিলা আকৃতির কন্সেটবলে হাত ভাঙে, ইন্সপেক্টরের চোখে ঘুষি মারা হয় এবং এডিসির হাত ধারালো কিছু দিয়ে অনেক বড় পোস মারা হয়। তারপর তাকে ধরে নিয়ে এসে চরম টর্চার করা হয়, এবং সেলেও হ্যান্ডকাফ লোহার শিকের সাথে লাগিয়ে তাকে রাখা হত। ধীরে ধীরে এসব শিথিল হয়। তবুও দফায় দফায় তার সেল চেকে আসতো। তার জিনিসপত্র সব নষ্ট করে ফেলা হত। প্রথম দফায় ছিল ২-৩ মাস, পরের দফকায় প্রায় বছর খানেক হতে চললো এই গুম অবস্থার।

এবার হচ্ছ সবাচইতে ইন্টারেস্টিং ঘটনা। কন্সটেবলদের মুখ থেকেই শুনেছি যে, সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে যে, চাবির তোড়াটা টেবিলের উপর রেখে কন্সটেবল ঘুমিয়ে গিয়েছিল। টেবলিটা হচ্ছে ওই যে যেখানে গার্ডরা বসে। সে তার সেল থেকে বড়সির মত কি একটা জিনিস বের করে, সেটা দিয়ে চাবির তোড়াটা ওই টেবিল থেকে তার সেলে নিলো। তারের নিজের সেলের তারাল খুললো, এবং সেই চাবিটা খুলে রাখলো, এরপর, বাহিরের তালা খুলে চাবিটাও খুলে চাবির তোড়া ভিতরে রেখেই সে কম্বল নিয়ে চলে গেলো। বলো রাখা ভালো

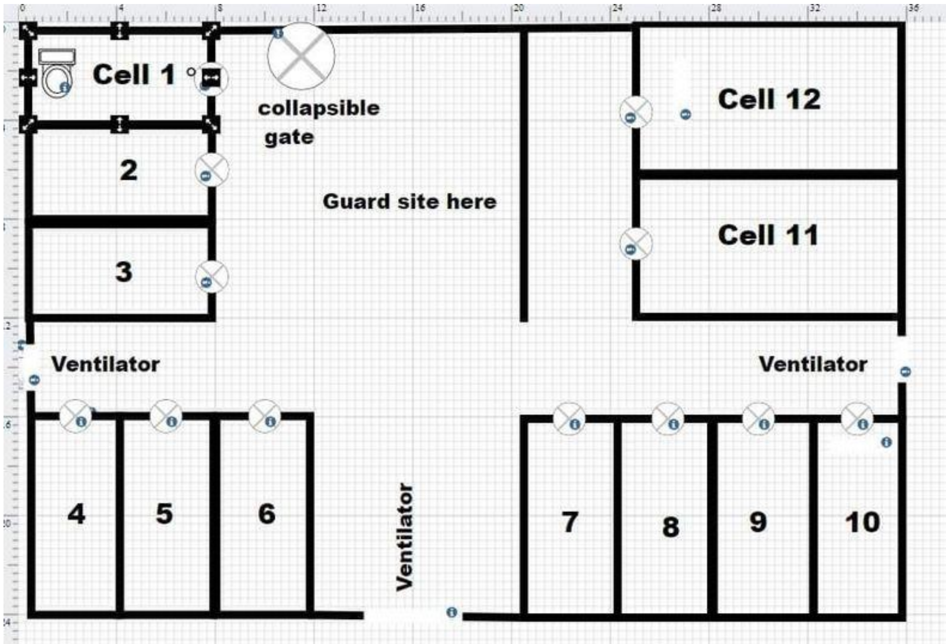
যো, ওইদিন ছিল ঈদের পর প্রথম জুমাবারের আগের রাত। অর্থাৎ ওইদিন লোকজনের আনাগোনা কম থাকবে।

পালানোর কিছুদিন আগে ওই বন্দী ভাইটা খুব অসুস্থ হয়ে যায়। অনেক গালাগালির পরও যখন তার কষ্টের চোটে কোকানো কমছিল না, পরে তাকে হসপিটালে নেয়া। হয়। হসপিটালে যাওয়ার পর নাকি, সাথে থাকা পুলিশরা নিজেদের চেকআপ করায়। শোনা কথা হল, ডাক।তার নাকি বলসে, রোগীর চাইতে নাকি পুলিশদের শারীরিক অবস্থা খারাপ। সে যাই হোক, তাদের ধারণা সে এ্যাকটিং করসে সেইদিন। এখন প্রশ্ন হলো ওই বড়শিটা সে কই পেলো? আমরা তো দেখি নি বড়শিটা আসলে কিভাবে পেলো বা বানালো। আমরা শুধু ধারণা করতে পারি। তো ধারণাটাই আপনাদের বলছি।

মাঝে মাঝে এক ঝাড়ুদার আসত, ঝাড়ু দিতে। আমরা চাইলে আমাদেরকেও দিতো। আমরা নিজেদের সেল ঝাড়ু দিতাম। তো ওই ভাইটা এভাবে ঝাড়ু নিয়ে ওখান থেকে ফুলঝাড়ুর নিচের গোল নলখাগড়ার মত অংশটা একটা একটা করে খুলে রাখতো। আর লোহার তার দিয়ে যে ঝাড়ু বাঁধা থাকতো এগুলোও একটা একটা করে খুলে জামতো। একসাথে করলে তো বিষয়টা নযরে চলে আসবে। তাই একটা একটা করে। ঝাড়ুদার প্রতিদিন হয়ত একই ঝাড়ু নিয়েও আসে না।

অনেক চিল্লাচিল্লির পর তারা ভাতের সাথে ওই পঁচা তরকারী না দিয়ে একটা পলিথিনে করে দিতো রাজি হয়। এতে আমাদের লাভ হল তরাকারির কারণে ভাতটা অন্তত নষ্ট হত না। রুচিতে হলে তরকারি খেতাম নতুবা শুধুভাত। কখনো কখনো ডাল যদি সেটা ভালো পড়ে। তো তরকারী-ডাল যে পলিথিনে দিত, ভাইটা সেগুলো জমাতো। এবং পলিথিন, লোহার তার আর ঝাড়ুর নীচের অংশ দিয়ে একটা বড়শির মত বানালো যেটার মাথায় লোহার তার দিয়ে আংটার মত করে বাঁকা করা। যেন চাবির তোড়াটা সেখানে আটকে যায়। যেহেতু এর আগেও একবার সিড়ির ঘর দিয়ো পালিয়েছিল, তাই এবারও তার নিশ্চয়ই জানা ছিল কিভাবে পালাতে হবে।

এ ঘটনাটি ছিল যেন সিটিটিসির গালে এক বড় চপেটাঘাত। সিটিটিসি প্রধান সেই শুক্রবার দৌড়ে অফিসে চলে আসে, সেল পরিদর্শন করে, সবার চোখে মুখো বিশ্ময়। আমি নিজেই কিছুই দেখছিলাম না, যদিও আমি উপস্থিত। শুধু মানুষের কথা শুনছিলাম আর বুঝতে চেষ্টা করছিলাম। এই ঘটনার ১ দিন পরই আমার নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে আমাকে কোর্টে চালান করে দেয়া হয়। তো এই গুম থেকে পালানো অবিশ্বাস্য ভাইটাকে ধরার সময়, তারা বাসার বালিশ-চাদরও এরা লুট করে নিয়ে আসছিল, সাথে তো ঘরের আরো কত সম্পদ। তো কন্সটেবলরা সেই বালিশ-চাদরগুল ইউস করতো। গার্ড দেয়ার সময় সেগুলো নিয়ে আসতো মেঝেতে ফ্লোরিং করে শোয়ার জন্য। তখন ভাইটা বলতো, এটা দাম এত ওইটার দাম অত। কবে কোথা থেকে কিনসিলো। আর গার্ডদের বলতো, ভালোই গণিমতের মাল ইউস করতেসো, কত সুখ তোমাদের! তো এই হল ঘটনা!



আয়নাঘরনামা ১৩

আমি মাসরুর আনোয়ার চৌধুরী।

পেশা : FREELANCE PROCUREMENT AND SUPPLY CHAIN SPECIALIST .

গুম হওয়ার আগে দুটো মাল্টিন্যাশনাল হোটেল চেইন

RADISSON BLU CHITTAGONG AND HOLIDAY IN DHAKA তে চাকরি করতাম।

পড়াশোনা Independent University of Bangladesh থেকে Electrical and Electrics engineering (EEE) এ B.Sc পাশ করি ২০১৩ সালে।

স্কুল: চট্টগ্রাম সেনানিবাস উচ্চ বিদ্যালয় (২০০৫)

কলেজ: চট্টগ্রাম পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ (২০০৭)

২০২০ সালের জানুয়ারিতে

Hoilday in Dhaka City Center,

নতুন ওপেন হওয়া তেজগাতে একটি multinational hotel Chain এ Purchase Manager হিসবে জয়েন করার তৃতীয় মাস।

ক্যারিয়ারের চার বছরের মধ্যেই মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে Procurement Manager পদে সিক্স ডিজিট স্যালারিতে কর্মরত ছিলাম।

ক্যারিয়ার গ্রোথের পাশাপাশি আমার লিখালিখির একটা নেশা হয়ে যায়।

প্রথম দিখে রম্য টাইপ লিখা লিখলেও, পরে আমার লিখালিখির বিষয় হয়ে উঠে আওয়ামীলীগের জুলুম অত্যাচার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে। ইসলাম বিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে।

ভয় ডর না করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লিখালিখির নেশা আমি কখনো ছাড়তে পারিনি শত ব্যাস্ততার মাঝেও!

২০২০ সাল, মোদীর আগমনের বিরুদ্ধে দেশ উত্তাল। তারই ধারাবাহিকতায়, ফেব্রুয়ারি এর শেষদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি বিরোধী একটি স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম। তাও দুই লাইনের।

তারই ফলাফল, ২০২০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি আইনাঘরে যাত্রা ...

সে যাত্রার এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা আজ আপনাদের জানাবো।

সকাল ৮- ৮.৩০ মিনিটে রিকশা নিয়ে অফিসে রওনা দিলাম বাড্ডার গুদারাঘাট এলাকার বাসা থেকে।

হাতিরঝিল পুলিশ প্লাজার সামনে আসার পর আমার রিকশা কে আটকে দেয় একটি সাদা মাইক্রো, সাথে সাথে নেমে আসে পাঁচ ছয় জন সাদা পোশাক পরা ব্যাক্তি।

আমাকে রিকশা থেকে নামিয়ে আমার সেই ফেসবুক স্ট্যাটাস দেখিয়ে বলে আমার নাম মাসরুর কিনা, আমি বল্লাম " হ্যাঁ "

সাথে সাথে আমার দুই পাশে দুইজন হাত ধরে মাইক্রোতে উঠার জন্য বলে, আমি আতঙ্কিত হয়ে বলতে থাকি "ভাই আমার দুইটা ছোট ছোট সন্তান, আপনারা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন। "

টিমের অফিসার তার RAB এর আইডিকার্ড দেখিয়ে বলেন, বুঝতেই তো পারছেন, আমরা কে?

গাড়িতে উঠেন এখুনি, নাইলে শুট করবো।

আমি ভয়ে উঠে পড়ি। পেছনের সিটে উঠিয়ে আমার চোখ বেঁধে ফেলে, পেছনে হাত নিয়ে হাতকড়া পড়িয়ে দেয় সাথে সাথে।

পেছনে অস্ত্র সস্ত্র দেখে আমি অনেক ভয় পেয়ে গেলাম।

গাড়ি চলা শুরু করলো,

আমার মোবাইল নিয়ে ফেল্লো, আমার ফেসবুক এ ঢুকে, বিভিন্ন পোস্ট নিয়ে কথা বলতে লাগলো, তাচ্ছিল্য সূরে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন স্যার?

অফিসার জবাব দিলো, তোমাকে তোমার অফিসে নিয়ে যাবো, জিজ্ঞাসাবাদ করবো কিছু। তারপরে ছেড়ে দেবো।

আমি আর কিছু বল্লাম না।

অফিসার বলা শুরু করলো "মাসরুর তুমি যদি আমরা যা জিজ্ঞাসা করি তার সত্য উত্তর দাও, তাহলে তোমাকে ছেড়ে দেবো। "

এরপরে আমার সম্পর্কে, আমার পরিবার সম্পর্কে, ক্যারিয়ার নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকলো আর আমি গাড়িতেই সব উত্তর দিতে থাকলাম।

এক ঘন্টা গাড়ি চলার পর দেখলাম গাড়ি থামলো। অফিসার ফোনে কথা বলছে নেমে, শুনতে পেলাম, তারা তিনশ ফিট আছে।

তা শুনে আমার বুক ধুক করে উঠলো,

কারণ তিনশ ফিটে অনেক ক্রস ফায়ার হয়েছে।

আমি শিওর হয়ে গেলাম তারা আমাকে ক্রস ফায়ার দেবে। কালেমা পড়ে নিলাম, দোয়া পড়তে লাগলাম।এবং জোড়ে জোড়ে দোয়া ইউনূস পড়তে লাগলাম।

সাথে সাথে চোখে ভেসে আসতে লাগলো আমার ছোট দুই সন্তানের ছবি, আমার মা বাবা, স্ত্রীর ছবি।

কিন্তু তারা আবারো গাড়ি চালানো শুরু করলো। পাশের একজন আমাকে বিভিন্ন আলেমের ওয়াজ শোনাতে লাগলো, মোবাইল দিয়ে। আর বলতে লাগলো, জিহাদি ওয়াজ লতো তোমার খুব প্রিয় তাই না?

তোমরা তো জঙ্গি হতে চাও তাই না?

আমি তখন রেগে গিয়ে বলি "ভাই এইসব আমাকে শোনাইতেসেন কেন? পারলে চোখ খুলে দেন!! এইরকম অমানবিকতা কেন করছেন? কি অপরাধ করেছি আমি? "

তখন আমার ঘাড় চেপে ধরে বলে "চোপ শালা কথা বলবিনা একটাও "

আমি চুপ মেরে যায়।

আর এক ঘন্টা চালানোর পর আমাকে নামানো হয় গাড়ি থেকে

ছোট একটা রুমে নিয়ে যাওয়া হয়।

আমার চোখ আর হ্যান্ডকাপ খুলে দেয়া হয়।

সে রুমে তিন ফিট উচু দেয়াল দেয়া পার্টিশান টয়লেট। পাশে শোয়ার বিছানা। মানে টয়লেট আর বিছানা এক সাথে।

তখন শীতকাল ছিলো, গায়ে একটা জ্যাকেট ছিলো। আমি জ্যাকেট খুলে, মুখের উপরে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

আমি জানিনা আমি ক্যামনে ঘুমিয়েছি।

আল্লাহ তায়ালা যেন আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন সেদিন।

ঘন্টাখানেক পর, পাশে একজনের কান্না শুনে ঘুম থেকে উঠে পড়ি। তাকে জিজ্ঞাসা করি, ভাই আপনাকেও কি তুলে এনেছে?

সে কোন উত্তর দেয় না।

কিছুক্ষণ পড় এক রক্ষী এসে আবার চোখ বন্ধ করে আমাকে নিয়ে যায় আরেক রুমে।

চেয়ারে বসিয়ে, পা বাঁধা হয়, হাত বাঁধা হয়।

আমি বুঝে নিলাম আমাকে টর্চার করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

হঠাৎ করে লাঠি দিয়ে আমাকে পেঠাতে থাকে, দুই পাশ থেকে। আর বলে, তোর সাথে আর কে কে আছে, নাম বল।

তোর সাথে তোর বাসার সামনে আড্ডা দেয়, চা খায় এরা কারা, নাম বল।

আমি তখন দুইটা ভাইয়ের নাম বলি, যাদের সাথে আমি আড্ডা দিতাম অফিস শেষ করে।

নাম বলার পর ওরা আমাকে ফেসবুক থেকে ছবি বের করে, আমার চোখ খুলে ওদের ছবি দেখায়,এবং জিজ্ঞাসা করে ওরাই তারা কিনা, সাথে ফোন নাম্বার নেয় আমার কাছ থেকে।

আবার চোখ বন্ধ করে আমাকে সেলে নিয়ে আসে।

আমি বলেছিলাম, আমার অনেক ক্ষিধা লেগেছে, তখন আমাকে একটি বন রুটি দিয়ে যায়। আর পানি খেতে বল্লো টয়লেটের কলের পানি থেকে। আমি খেয়ে নিলাম। কারারক্ষীকে অনুরোধ করলাম আমাকে একটা কোরআন দিতে।

সে একটি কোরআন দিয়ে যায়, আমি সারাদিন নামাজ পড়লাম, কান্না করে করে, চিৎকার করে কোরআন পড়তে থাকলাম!

আমাকে এসে হুমকি দিয়ে গেলো যাতে আস্তে পড়ি।

একিই দিন মধ্যরাতে আমাকে আবারো ইন্টারোগেশনে নিয়ে আসা হয়! আবারো জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলো।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে চ্যারিটির কাজ করেছিলাম সেসব নিয়ে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবার করা হলো।

আমাকে জঙ্গি দলের সাথে সম্পৃক্ততা থাকা স্বীকার করতে বল্লো।

আবারো কিছু নাম বলতে বল্লো। আমি বল্লাম আমি কোন রাজনীতি করিনাই, কোন দল করিনাই।

তাই কোন নাম বলতে আমি পারবো না।

জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আমাকে আবারো ফিরিয়ে আনা হলো সেলে।

পরের দিন!

চোখ, হাত বেঁধে ফেলা হলো। আবারো একটা গাড়িতে তোলা হলো। গাড়ি চলতে লাগলো এক অজানা গন্তব্যে।

এবং এবারো শিওর হয়ে গেলাম আমাকে ক্রস ফায়ার দিতে নিয়ে যাচ্ছে।

আমি পেছনের সিটে বসে হেলান দিয়ে চোখ বাঁধা অবস্থাই ফাঁক দিয়ে দেখছিলাম কোথায় যাচ্ছি আমরা।

এক ঘন্টা পর গাড়ি এসে থামলে আমি পিলার সাইনবোর্ড এ লিখা দেখি

"র্যাব হেডকোয়াটার" বাংলাতে লিখা।

একজন রেব সদস্য বুঝে ফেলে আমি দেখছি সবকিছু, সে সাথে বলে উঠলো, এই এই

ও তো সব দেখছে !!

সাথে পাশে থাকা সদস্য আমার চোখের বাঁধন টাইট করে দেয়। আরে নিচে টিস্যু ঢুকিয়ে দেয়।

তারা আমাকে ধরে সিড়ি বেয়ে উপরে নিয়ে যায়।

উপরে নিয়ে চোখ আর হাত খুলে দিলে দেখতে পায়, একটা অন্ধকার রুম চারপাশে কালো কাপড়।

মাথা নিচু করে থাকতে বল্লো লাঠি দিয়ে গুঁতো দিয়ে। আর এক প্লেট ভাত এনে দিলো, সাথে এক টুকরো বিস্বাদ মাছ।

বল্লো সব ভাত খাবি, আর খাওয়ার পর হাত ধুয়ে সে পানি গিলবি!!

আমি বল্লাম আমি খেতে পারবো না এই ভাত।

তারা কয়েকবার জোড় করলো, আমি খেতে পারিনাই।

পরে এক গ্লাস পানি খেলাম।

ঐ রুমেই কিছুক্ষণ আমাকে বসিয়ে রেখে, এক সেট কাপড় দিলো, লুঙ্গি আর টি শার্ট।

কাপড় চ্যান্জ করে সেগুলো পড়তে বল্লো।

আমি পড়ে নিলাম। আবার চোখ বেঁধে, হ্যান্ডকাফ পড়িয়ে একটা অন্ধকার সেলের দরজা খুলে আমাকে ফেলে গেলো।

আর বলে গেলো, যাতে নাড়াচাড়া না করি। কোন আওয়াজ না করি।

আমার হাত পেঁছন থেকে হ্যান্ডকাফ, খুব টাইট করে বাঁধা ছিলো। বল্লাম ভাই আমার হাত কেটে যাচ্ছে। প্লিজ একটু ঢিল দেন।

রক্ষী ঢিল করে দিলো।

এবার আমি শুয়ে শুয়ে কান্না করতে থাকি।

শুনশান নিরবতার মধ্যে opposite থেকে কে যেনো শশশশ করে আওয়াজ করছে।

আমি আবারো চোখের নিচ দিয়ে দেখার চেষ্টা করতে লাগলাম। করিডোর দিয়ে আসা হালকা আলোতে দেখলাম আমার ঠিক opposite এ একজন হাত নাড়ছেন। আমি উঠে বসলাম এবার। বুঝতে পারলাম আমার মত কোন এক হতভাগা।

এবার সে আমাকে ইশারাতে শিখিয়ে দিলো,

পেছন থেকে হ্যান্ডকাফ পড়া অবস্থায় কিভাবে হাত সামনে আনতে হয়।

আমি পায়ের নিচ দিয়ে হাত সামনে আনলাম।

সাথে চোখের বাধন টা উপরে উঠালাম।

তিনি এও বলে দিলেন, সে কাশি দিলেই যাতে আবার আগের মত চোখের বাধন বন্ধ করে দিয়। হাত পেছনে নিয়ে।

কারণ ওরা যদি বুঝতে পারে আমি চোখ খুলেছি, তাহলে প্রচুর মারবে।

আস্তে আস্তে দেখতে পেলাম আমার অপজিটে চারটা সেলে চার জন। আর আমার দুই পাশে আছে দুইজন, কিন্তু তাদের আমি দেখতে পাইনি।

Opposite এর সে ভাই আমাকে মেন্টাল সাপোর্ট দেয়া শুরু করলেন। তিনি আমাকে শান্ত হতে বলেন, ধৈর্য ধরার নসিহা করেন।

আর বলেন সবকিছু ভুলে এক আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে। আল্লাহ তায়ালাই সেইভ করবেন। তিনি এই সব কিছুই ইশারা আর ফিশ ফিশ করে মুখ নেড়ে আমাকে বলতে থাকেন। অনেক সময় অনেক কথা বুঝতাম না। তখন দেয়ালে হাতের ইশারায় লিখে বুঝাতে চেষ্টা করেন। কিছু বুঝতাম, কিছু বুঝতাম না।

এক ভাই কে কাতার থেকে আসার পর এয়ারপোর্ট থেকে তুলে আনা হয়।

আরেক ভাই বয়স ১৭-১৮ বছর মাত্র, তাকেও চট্টগ্রাম থেকে তুলে এনে সেখানে রাখা হয়।

১৭ -১৮ বছরের ছেলেটা এত শান্ত, এত নিরীহ। ওল্টা সে আমাকে মুরুব্বির মত শান্তনা দিচ্ছিলো, যখন আমাকে দেখতো আমি হতাশ হয়ে পড়ছি। কান্না করছি।

পাশের আরো দুইজন ভাই ,একজন ভোলা থেকে।

অন্যজনদের গুলো খেয়াল নেই।

আরেকজন ছিলো, যে হঠাৎ হঠাৎ চিৎকার করে উঠতো, ভয়ঙ্কর চেহেরার কিছু রক্ষী তাকে গরুর মত পেটাতো। পিটা খেয়ে সে ভয়ঙ্কর করুণ সূরে কান্না করতো।

ওরে চলে যাওয়ার পর

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন তাকে মারে।

এক ভাই বল্লেন মার খেতে খেতে সে পাগল হয়ে গেছে, এবং ল্যাংটা থাকে। তাই মারে।

আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম তারা এইখানে কত দিন ধরে। কেও বলে তিন বছর, কেও বলে দুই বছর, জিজ্ঞাসা করলাম মিনিমাম কতদিন রাখে এইখানে।

তারা বল্লো এক, দুই বছর!!

আমি সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে বিশ্বাস করে নিলাম আমি আর হইতো বের হতে পারবো না।

আমার বাবা মা, আত্মীয়স্বজন কখনো জানবে না আমি মরে গেছি নাকি বেচে আছি।

আমার ছোট দুই সন্তাকে খুব মনে পড়তে থাকে। আমার মা বাবা আর স্ত্রীর কান্নামাখা মুখ বার বার মনে পড়ছিলো।

আমি জিকির করতে থাকি, নামাজ পড়তে থাকি!আর মাঝে সুযোগ পেলে অন্য বন্ধিদের সাথে কথা বলতে থাকি! এভাবেই এদিনটি কেটে যায়।

বাই দ্যা ওয়ে সেলের একটু বর্ননা দিচ্ছি।

আপনারা যে আইনাঘর নামের ঘরগুলো দেখছেন, তার চাইতেও নোংরা অন্ধকার সেল ছিলো সেগুলো। সূর্যের আলোও আসতো না।

সবসময় রাত হয়ে থাকতো। আজান হলে

রক্ষীরা এসে বলে যেতো কোন ওয়াক্তের নামাজ।

ওযু টয়লেট গোসল করার জন্য পাঁচ মিনিট টাইম নির্দিষ্ট করা থাকতো। তারা এসে হাত ধরে টয়লেট করতে নিয়ে যেতো, আবারো টয়লেট শেষ হলে তারা ধরে এনে সেলে ঢুকিয়ে দিতো।

এমনকি টয়লেটের দরজা পুরো বন্ধ করা যেতো না। তারা দেখে থাকতো কি করছি।

পরের দিন সকালে আমাকে সেল থেকে বের করে আরেকটা রুমে নিয়ে ইন্টারোগেশন শুরু করলো। এবার তিন চারজন ইন্টারোগেইট করলো ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠ তাই মনে হলো।

সেইম প্রশ্ন, আমিও সেইম উত্তর দিয়।

তারা বিরক্ত হয়ে আমাকে পেটাতে থাকে।

আমি কান্না করে বল্লাম ভাই আমি কি বানিয়ে বানিয়ে বলবো।

আমাকে পাশ থেকে ফিস ফিস করে একজন বল্লো তোকে এইবার আরো কঠিন শাস্তি দেবো, কিছু নাম বল। ছেড়ে দেবো।

আমি বলি, আমি কাওকেই চিনিনা।

শেষে আমার ফেসবুক ম্যাসেন্জারের আইডি ধরে ধরে জিজ্ঞাসা করছিলো। তারা হতাশ হলো কোন সন্তুষ্টজনক উত্তর না পেয়ে।

ওরা কোন উত্তর না পেয়ে আমাকে আবারো সেই অন্ধকার সেল /আইনাঘরে নিয়ে এলো।

অতঃপর এভাবেই কেটে যায় দিন রাত, ইন্টারোগেশন, আবারো সেলে।

আমাদের ভাত দেয়া হতো, যেগুলো ছিলো বিস্বাধ, খাওয়ার পরে হাতে ধূয়ে প্লেটের পানিগুলো খেতে হতো!! প্লেট পরিস্কার করেই ফেরত দিতে হতো। সকালে নাস্তাগুলোও ছিলো নিকৃষ্ট।

এরপর সাত আটদিন পর একদিন একজন রক্ষী এসে আমাকে, আমার কাপড়চোপড় দিয়ে বলে, এগুলো পড়ে নে।

আমি বুঝলাম এইবার আর রক্ষা নাই।

ক্রসফায়ার দিয়েই দিবে।

কালেমা দোয়া পড়ে নিলাম। স্মরণ করলাম আমার পরিবার কে। তাদের জন্য দোয়া করলাম।

হঠাৎ আমাকে নিয়ে বের হয়ে যাওয়াতে ভাইদের আর বিদায় জানাতে পারলাম না।

গাড়িতে তোলা হলো, আবার গাড়ি চলতে লাগলো। এক ঘন্টা পর গাড়ি থেকে নামানো হলো। আবারো সেই প্রথমদিনের সেলে ঢুকানো হলো।

তখনো পর্যন্ত বুঝতে পারিনি সেই সেলটি কোন জায়গায়।

দেখলাম যে দুই ভাইয়ের নাম ওরা জিজ্ঞাসা করেছিলো সে জুনিয়র দুইটা ভাইকেও ওরা তুলে এনেছে। ওরাও ছিলো অন্য আইনাঘরে!!

আমাকে একবারের জন্যও বুঝতে দেয়নি, ওরা আমার এই দুই ভাইকেও ধরেছে।

এক ভাইকে পাশের সেলেই রাখলো। আরেক ভাইকে অন্য সেলে! নিজেকে তখন ক্রিমিনাল মনে হতে থাকলো। অনুশুচনা করতে লাগলাম কেন তাদের নাম বল্লাম। আমার জন্য তাদের জীবনটাও গেলো।

ঐদিন রাতেই আমরা তিনজন সাথে আমাদেরও আগে তুলে আনা এক মাদ্রাসার ভাইকে , গাড়িতে তোলা হলো।

এত রাতে গাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছে দেখে আমরা সবাই গাবড়ে গেলাম।

কিন্তু আবার আমার নিজের মনে হতে লাগলো আমাদের মে বি ছেড়ে দেবে।

গাড়ি চলতে চলতে কিছুক্ষণ পর থামলো, আমি চোখ বাঁধা অবস্থাতেই ফাঁক দিয়ে দেখলাম দেখলাম একটা হোটেলের সামনে, গাড়িটা দাড়িয়েছে। গাড়িটার দরজা খুলে এক সদস্য নামলো। সে দেখলাম হঠাৎ করে চিৎকার দিয়ে উঠলো,

"এই জঙ্গি ধর, জঙ্গি ধর "এই ধর ধর "

আমি আরো আতঙ্কিত হয়ে গেলাম, মনে করলাম এই গুলি করে দেবে!!

কিন্তু চোখের নিচ দিয়ে দেখতে পেলাম হোটেল থেকে চারটা ছেলেকে ওরা ধরে নিয়ে আসলো। গাড়িতে তুল্লো।

মনে মনে ভাবলাম সত্যি সত্যি জঙ্গি ধরে আমাদের সাথে হয়তো মিশিয়ে দেবে।

গাড়ি দরজা বন্ধ করে দিয়ে, আবারো একিই জায়গাই আসলো। পুরাই ভ্যাবাছ্যাকা খেয়ে গেলাম। কিন্তু দেখলাম যে যে চারটা ছেলেকে তারা গাড়িতে উঠালো, গাড়ি থেকে নেমে তাদের সাথেই দাড়িয়ে তারা আবার গল্প করছে। হাঁসি ঠাট্টা করছে। বুঝতে পারলাম,

ওরা আসলে সোর্স ছিলো

আমি এবার দেখলাম আশপাশে RAB 11 লিখা কিছু গাড়ি। শিওর হলাম প্রথমে এনে তারা এখানেই রেখেছিলো।

এবং RAB 11 এর কয়েকজন অতি উৎসাহী ব্যাক্তি এই কাজটি আমাদের সাথে করেছে।

((বিশেষ কারণে আমি আমার ভুক্তভুগী ছোট দুই ভাইয়ের নাম বলছিনা। দুঃখিত।))

যায় হোক ...

আবারো সেলে ঢোকানো হলো। সবকিছু শান্ত হয়ে আসলে, পাশের জনকে জিজ্ঞাসা করলাম "ছোট ভাই কাহীনি কি

ছোট ভাই বল্লো "ভাই বুঝলেন না, কেস সাজিয়েছে তারা "

আমি জাস্ট কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রইলাম।

এত জঘন্য, জালিম, নিকৃষ্ট RAB এর ঐ ব্যাক্তিগুলো?

এত চোখের পানি ফেল্লাম, তাদের মন গলেনি।

আমার ছোট দুই সন্তানের কথা শুনেও তাদের মন গলেনি। আরো মিথ্যা মামলা সাজানোর নাটক করলো???

যাই হোক ....

পরের দিন আমাদের চারজনকে সকালে বন আর মিস্টি খাওয়াইয়ে। বের করে আনলো বাইরে। এবার চোখ খোলা, কিন্তু হ্যান্ডকাফ পড়ানো।

সামনে দেখলাম সময় টিভিসহ এক ডজন মিডিয়া।

তারা হাটতে বল্লো। দুই পাশে দুই র‍্যাব সদস্য আমাদের হাঁটাতে থাকলো।

হাঁটিয়ে আবারো সেলে ঢোকানো হলো।

আমরা স্তব্ধ হয়ে, নিশ্চুপ থেকে সব দেখে রইলাম। কোন টু শব্দও করলাম না।

সেদিন রাতেই আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় নারায়ণগন্জের ফতুল্লা থানায়।

আমি উদ্গ্রিব হয়ে খুঁজছি একটা ফোন।

হঠাৎ পেয়ে গেলাম এক মুরুব্বিকে। তাকে রিকোয়েস্ট করে তার ফোন নিয়ে আমি আমার মাকে কল দিয়ে। ধরে আমার বাবা,

"আমি কান্না করে বলি বাবা আমি মাসরুর "

আমার বাবা হু হু করে কান্না করতে থাকেন!!

জিজ্ঞাসা করেন আমি কোথায়, আমি বল্লাম ফতুল্লা থানায়।

এক পুলিশ সদস্য এসে ছো মেরে ফোনটি কেড়ে নেয়।

অতঃপর পুরো রাত আমাদের থানার গাড়দে রেখে পরের দিন চালান করে দেয় নারায়ণগঞ্জ জেলখানায়।

আর আমাদের নামে মামলা হয় এই বলে যে,

"নারায়ণগঞ্জের সাইনবোর্ড এলাকার হোটেলের সামনে গোপন বৈঠকে থানায় নাশকতা পরিকল্পনা করার সময় আমাদের হাতেনাতে ধরে ফেলে RAB 11। তারা প্রমাণ পেয়েছে আমরা জঙ্গি সংগঠনের সদস্য। আমরা রাষ্ট্রদ্রোহী। আমাদের সাথে পেয়েছে বিভিন্ন জঙ্গি বই। "

মিথ্যা দিয়ে ভরা, সাংঘর্ষিক বর্ণনার এই মামলা দেখে যে কেও বলে দিতে পারে এটি একটি ভুয়া মামলা।

অতঃপর এই মিথ্যা মামলাতে জামিন ক্যান্সেল হতে হতে জেলখানায় কাটিয়ে দিলাম মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত, প্রায় দশ মাস।

দশ দিন ভয়ঙ্কর গুম জীবন, দশ মাসের দুর্বিষহ জেল জীবন এর মুক্তির পর ....

আমি এসে দেখি আমার আট মাসের হামাগুড়ি দেয়া ছেলে ইনতিসার দৌড়াচ্ছে।

আমার মেয়ে ইয়ামিনা বড় হয়ে গেছে।

সে জেল জীবনের গল্প না হয় আরেকদিন বলবো ....

সে মিথ্যা মামলার চার বছর ধরে আজো হাজিরা দিয়ে যাচ্ছি, চট্টগ্রাম থেকে নারায়ণগঞ্জ গিয়ে।

জানিনা সে মামলা থেকে রেহায় পাবো কিনা,

জানিনা সে মামলাতে রায় হয়ে আবারো জেলে পঁচতে হবে কিনা।

জেল থেকে বের হয় দেড় বছর বেকার ছিলাম। কোন জবও আর করতে পারিনি।

জঙ্গিকে কে আর জব দেবে বলেন?

লোন নিতে নিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

জেল জীবন আর এর পরবর্তী কয়েকবছরের জীবন ছিলো আরো দুর্বিষহ।

যাই হোক, আপনারা জেনে রাখুন, যা বলেছি, তার প্রতিটি কথায় সত্য। এবং আপনাদের আজ সাক্ষী করলাম।

RAB 11 এর কিছু দূর্নীতিগ্রস্ত ব্যাক্তি প্রমোশনের জন্য, টাকার জন্য, এসব করে বেড়াতো।

বিদেশীদের ওরা খুশি করার জন্য মিথ্যা জঙ্গি নাটক সাজাতো। আর সরকার থেকে ম্যাডেল পেতো!

এই সেইম ব্যাক্তিগুলোই এইরকম শত শত নিরপরাধ মানুষকে গুম করেছে নির্মম টর্চার করেছে। অতঃপর জঙ্গি মামলা দিয়ে বছরের পর বছর জেল খাটিয়েছে।

এদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পায়নি নারীরা পর্যন্ত।

ওরা নারীদেরকেও গুম করতো, টর্চার করতো, এবং মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে এ দিতো।

এদের বিচার এই বাংলার জমিনে হতেই হবে।

ইন শা আল্লাহ।

তবেই আমাদের স্বাধীনতার পূর্ণতা পাবে।

আয়নাঘরনামা ১৪

"কলেজ পালিয়ে যে বই পড়া হচ্ছে, বাসায় জানে?"

শুনে চমকে উঠলাম। হাতে তখন আবু ইসহাকের পদ্মার পলিদ্বীপ। এক রাশ আতঙ্ক নিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখি, হাফিজুর ভাই।

আমার মুখে হাসি চলে আসে। হাফিজুর ভাই আর যাই হোক, বই পড়ার জন্য বাসায় বিচার দেবে না, আমি জানি।

লাইব্রেরিতে জোরে কথা বলা যায় না। ফিসফিস করে বললাম, চলো বাইরে যাই। পড়তে বিরক্ত লাগতেসে।

রাজশাহী সেন্ট্রাল লাইব্রেরি নিউ ডিগ্রী কলেজের পাশেই। বহু পোলাপাইন এখানে বসে ফোন টিপতে আসে, প্রেম করতে আসে। আমি সত্যিকার অর্থেই বই পড়তে আসতাম।

বই পাইলে আমার মাথা কোনকালেই ঠিক থাকতো না।

তবে হাফিজুর ভাই ছিলো বইয়ের চেয়েও ইন্টারেস্টিং। এলাকার বড় ভাই। কলেজের বড় ভাই। তবে রাজনীতি করতেন আমার উল্টোটা। আমি তখন অনিমেষ পড়ে বাংলাদেশে বাম বিপ্লবের স্বপ্ন দেখি। আর হাফিজুর ভাই শিবির করে দেশে ইরানি স্টাইলে ইসলামি বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন।

কঠিন তর্ক করতাম সেই সময়। বেশিরভাগ সময়ই হাফিজুর ভাই আমার সাথে তর্কে হেরে যেতেন। তখন তো বুঝি নাই, এখন বুঝি উনি ইচ্ছা করে হারতেন আমাকে খুশি করার জন্য।

একবার কোন এক কারণে ইস্কুল থেকে বাসায় আসবো। রিকশা নাই। হাফিজুর ভাই দেখে বললেন, আমার সাইকেলে উঠো। দিয়ে আসি। আজকে ধর্মঘট।রিকশা পাবা না।

ছোটবেলা থেকেই আমি নাদুস নুদুস। সেই আমাকে নিয়ে গ্রীষ্মের দুপুরে ভাই হাপাতে শুরু করলেন। থামলেন দুইবার। আমার খটকা লাগলো। ভাইয়ের শক্তি এতো কম কেন?

বাসায় এসে দেখি আব্বুও আমাকে নিতে গেছে। আমি চলে এসেছি। আম্মু বললো, কীভাবে এলি? আমি বললাম হাফিজুর ভাই এর সাইকেলে।

আম্মু আতকে উঠলো। ওর সাইকেলে তুই উঠেছিস কেন? জানিস না ওর ক্যানসার?

আমি কিছু বলি না। এতো হাসিখুশি মানুষেরও ক্যান্সার থাকে? কই কোনদিন বলেনাই তো?

হাফিজুর ভাই মূলত ছিলেন লিউকোমিয়ার রোগী। তিনমাস পর পর রক্ত চেঞ্জ করতে হতো। অথচ এই লোকটা কত বড় অভিনেতা চিন্তা করেন, আমাদের কাউকে কখনও জানতে দেয় নাই।

এরপর ঐ লাইব্রেরির কাহিনী।

লাইব্রেরি থেকে বের হয়ে মালোপাড়ার দিকে একটা একটা ঘর দেখালেন। বললেন, কোচিং দিচ্ছি। তুমি তো সায়েন্স এ থাকবা, আর্টসে গেলে পড়তে পারতা।

ভাই তখন পড়েন রাজশাহী ইউনিভার্সিটির পাবলিক এডমিনস্ট্রেশনে।

আমি ভাবলাম, যাক। আড্ডার আর ঝগড়ার আরেকটা জায়গা আমাদের হলো।

আমি যখনই বাম বিপ্লব নিয়ে কোন বই পড়তাম, ভাইকে বিপরীতে কল্পনা করতাম। কল্পনায় তাকে হারিয়ে দিয়ে বিরাট মজা পেতাম।

এমনই একদিন হুট করে আব্বু এসে বললো শালবাগানে রাবির এক টিচার খুন হয়েছে।

সারাদেশে হইচই পড়ে গেল। আমরা আগ্রহ নিয়ে ওয়েট করতে শুরু করলাম। আব্বু বাজার না করেই চলে এসেছে। পরদিন আম্মু বললো ডিম নিয়ে আয় দোকান থেকে।

আমি ডিম আনতে গেছি। দোকানে অনেক ভীড়। সম্ভবত বাংলা ভিশনে বলা হলো, রাবির টিচার হত্যা মামলায় হাফিজুর রহমান নামে একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

আমি বাসায় আসলাম দৌড়াতে দৌড়াতে। আম্মুকে বললাম, হাফিজুর ভাইকে পুলিশ ধরেছে। আম্মু বললো ধুর, এইটা এই হাফিজুর না। অন্য হাফিজুর। যে ছেলে বড় গলায় একটা কথা বলতে পারে না, তারে পুলিশ কেন ধরবে?

অথচ আম্মুর জানা ছিলো না, একটা মাছি না মারতে পারা মানুষকে সাধারণ পুলিশ ধরতে না পারলেও হাসিনার পুলিশ ধরতে পারে।

হাফিজুর ভাইয়ের বাবার ভাষ্য ছিলো, ফজরের নামাজ পড়ে ভাই ঘুমাইছিলো। বাসা থেকেই ডিবি তারে তুলে নিয়ে যায়। ইভেন প্যান্ট পরার সুযোগ তারে দেওয়া হয়নি। টি শার্ট আর লুঙ্গি পরা অবস্থাতেই তাকে তুলে নেওয়া হয়।

সবচে বড় কথা, একজন ক্যান্সারের রোগীকে ওষুধ নেওয়ার সুযোগও পুলিশ তাকে দেয়নাই।

তাকে ৫ দিনের রিমান্ড দেওয়া হয়েছিলো যতদূর মনে পড়ে।

দুইদিনের মাথায় অনেক চেষ্টা চরিত করে ভাইয়ের বড় ভাই ওষুধ নিয়ে সেলে যাইতে পারছিলেন।

বাট তার আর দরকার হয় নাই।

কারণ এর কিছুক্ষণ পরেই হাফিজুর ভাই পুলিশ হেফাজতে মারা যান। বড় ভাইয়ের কাছে অভিযোগ করেছিলেন, তাকে ওষুধ দূরের কথা, পানিও খাইতে দেওয়া হয় নাই।

হাফিজুর ভাইয়ের লাশ আসার পর অদ্ভুতভাবে বৃষ্টি নামলো। এলাকার সমস্ত মানুষ হাউমাউ করে কানতে লাগলো। আমার দাদির মৃত্যুর পরেও আব্বুরে আমি কানতে দেখিনি। অথচ সেইদিন আব্বুও পারলো না, বললো, এই ছেলেটারেও এমনে মেরে ফেললো?

হাফিজুর ভাইয়ের বড় ভাই বললেন, ছোটবেলা থেকেই আমাকে খুব জ্বালাইসে। তিন মাস পর পর রক্ত দিতে হতো, কত ঝামেলা। আমার আর কোন ঝামেলা থাকলো না। বলে শিশুর মতো কানতে লাগলেন।

আমি দেখলাম, লাশ নিয়ে আসা পুলিশ সদস্যরা রুমাল দিয়ে চোখ মুছতেসে।

এই মৃত্যুর পর এই পরিবারটাই তছনছ হয়ে গেল। ভাইয়ের বাবা স্ট্রোক করলেন, মা প্যারালাইজ হলেন। এতো জুলুম সহ্য করা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হয়নি, মানুষ কতই বা আর পারে?

রেজাউল করিম হত্যা মামলা নিয়ে সবার আগ্রহ শেষ হলেও আমার হয়নি। আমি শেষদিন পর্যন্ত এই মামলার খোঁজ খবর রেখেছি।

চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। অপরাধীদের সেই লিস্টে সম্ভবত সাতজনের নাম ছিলো। না, সেখানে হাফিজুর রহমান নামে কোন নাম ছিলো না।

এর অর্থ হলো, ইভেন হাসিনার বানানো করাপ্টেড কোর্টও এই মামলার সাথে তার নূন্যতম সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ করতে পারেনি।

তাহলে আমার হাফিজুর ভাইকে মরতে হলো কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দূরের কথা, এই প্রশ্ন করার স্বাধীনতাও আমরা পাইনি কোনদিন।

৫ আগস্ট দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনেকেরই অনেকের কথাই মনে পড়েছে। আমার মনে পড়েছে হাফিজুর ভাইয়ের কথা ।

কলেজ পালিয়ে যে বই পড়া হচ্ছে, বাসায় জানে?

আমি খুব শক্ত ছেলে। অথচ যতবার এই কথাটা মনে পড়ে, আমি আর চোখ খোলা রাখতে পারি না।

হাফিজুর ভাই হিরো নন। ছিলেন না কোনদিন। তিনি অনিমেষ ছিলেন না, ক্ষুদিরাম ছিলেন না, ছিলেন একজন ক্যান্সারের রোগী। সাধারণ রাজনীতি করা পাবলিক ইউনিভার্সিটির একজন সাধারণ ছাত্র।

সেই মানুষটাকেও শেখ হাসিনা খুন করিয়েছিলেন। তাকে ওষুধ তো দূরের কথা, পানিও খাইতে দেওয়া হয়নি।

আজকাল বিকেলে বৃষ্টি হলেই হাফিজুর ভাই এর কথা মনে পড়ে খুব। মনে পড়ে, ক্যান্সার আক্রান্ত একটা হাসিখুশি মানুষ নিজের অসুস্থতা ভুলে একটা রুম নিয়েছিলো কোচিং সেন্টার চালাবে বলে।

কিন্তু সেই কোচিংটা তিনি আর কখনও খুলতে পারেননি।

ভয়ঙ্কর খুনি ড্রাকুলা হাসিনার কাছে থেকে রক্তশূন্য একজন লিউকোমিয়ার রোগীও ছাড়া পায়নি।

আয়নাঘরনামা ১৫

আয়নাঘরের খাবার ছিল একবারে বিচ্ছিরি রকমের । পচা মাছ , গলা ভাত । নোংরা লাল সবুজ প্লাস্টিকের বাটিতে খাবার দিত। ভাত মাছ একসাথে দিত । অনেক সময় রেখে এরপর দিত । গরম ভাত প্লাস্টিকের বাটিতে রেখে দেয়াতে মাঝে মাঝেই ভাত গন্ধ হয়ে যেতো । এরউপর মাছের নাড়ি ভুড়িও এমন কি কানকোও পরিস্কার করত না। সাথে মাঝে মাঝে ডাল দিত। সকাল বেলার খাবার ছিল খিচুরি আর আলু ভর্তা। যদিও একে খিচুরি বলা যায় না। তবুও এই খাবার টা একটু হলেও মুখে দেয়া যেত। আমি সকালের আলু ভর্তা হাফ তুলে রাখতাম দুপুরে ভাতের সাথে খেতে। কোরবানি ইদের পর পাশের ছেলে একটা ছেলে আসল । ইদের তিন/চারদিন পর ধরে নিয়ে এসেছে । ইদের ছুটি শেষ করে সবে কাজে ফিরছে। সহজ সরল সাধারণ ঘরের ছেলে। কাঠের কাজ করত। তার অপরাধ ফেসবুকে কিছু পোস্ট দিয়েছিল । শাইখ রাহমানির কিছু ভিডিও শেয়াও দিয়েছিল । ছেলেটা অতান্ত সহজ সরল ছিল । মাঝে মাঝেই চিৎকার করে কান্না করত। জোরে জোরে স্যার স্যার বলে রাতে ডাকত। দ্বিতীয় দিন এসে ই গার্ড কে বলতেছিল, স্যার আমার ভাত খাবার প্লেট লাগবে। এই জন্য বেচারাকে অনেক গালিগালাজ শুনতে হয়েছে। সে প্রথম ৫/৭ দিন বুঝতেই পারেনি সে গুম হয়েছে। সে ভেবেছে সে জেলে আছে। মাঝেই মাঝেই বাসার সাথে কথা বলার জন্য কান্না কাটি চিৎকার করত।

তাকে যখন উঠিয়ে আনে তার সাথে কিছু তেতুলের আচার ছিল । সে তাদের থেকে কিছু আচার চেয়ে নিয়ে আসে। সেখান থেকে আমাকেও কিছু দিয়েছিল। সেইদিন তৃপ্তি সহকারে অনেক ভাত খেয়েছিলাম আচার দিয়ে। মনে হচ্ছিল আমি কোন বড় রেস্তোরায় খাচ্ছি ।

এক ইন্ডিয়ান ভাই ছিলেন , খৃষ্টান , সেভেব স্টিসার্সের কোন দলের সদস্য। তিনি পচা সিল্ভার কাপ খেতে খেতে এত বিরক্ত হয়ে গেছিলেন যে, একবার বললেন , যদি কখনো সেভেন সিস্টার দখল করতে পারি সবার আগে সিলভার কাপ নিষিদ্ধ করব ।

এখন যখন বাসার বসে মজার মজার খাবার খাই । নিজেই অজান্তেই মাঝে মাঝে কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে যাই, চোখের সামনে ভেসে আসে সবুজ নিল বক্স, বক্সের ঢাকনা খুলতেই বোটকা একটা গন্ধ বের হচ্ছে ।

আয়নাঘরের খাবারের সাথে মোটামোটি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি, খাবারের সাথে কোন মেডিসিন মেশাত। খাবার পর ঘুম ভাব চলে আসত। আর বের হবার পর স্মৃতিশক্তি অনেক কমে গিয়েছে। সিম্পল ব্যাপারগুলো

ভুলে যাই। মানুষের নাম পর্যন্ত অনেক সময় মনে রাখতে পারিনা। এই স্মৃতিশক্তি কমে যাবার ব্যাপারে আমি একাধিক ব্যাক্তির সাথে কথা বলেছি, যারা সিটিটিসির আয়নাঘরে ছিলেন, সবাই বলেছেন তাদের স্মৃতিশক্তি আগের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছে।

তাছাড়া এত দীর্ঘ সময় পরেও শরীর ঠিক মত রিকোভার করে নি। আলহামদুলিল্লাহ গুম হবার আগে বেশ পরিশ্রমি ছিলাম, বেশীর সময় বাইরে ঘুরতাম। কিন্তু এখন সেই এনার্জি নেই। একটু পরিশ্রম করলে শরির ব্যাথা হয়ে যায়, অল্পতেই জ্বর চলে আসে।

আমার বিশ্বাস তারা স্লো পয়জিং করত। যাতে এর লং টাইম ইফেক্ট থেকে যায়।বান্দা রেজা ভাইকে দেখেছি একাধিকবার জেল খাটার পর অসুস্থ হয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত মারা যান। এসব বিষয়গুলোও সামনে নিয়ে আসা দরকার।

আয়নাঘরনামা ১৬

পুলিশকে নিয়ে শুধু একটি নিউজ শেয়ার করার অপরাধে আমাকে গুম করা হয়। যেতে হয় আয়নাঘরে। যেখানে চলে অবর্ণনীয় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। ঘটনার বিশদ বিবরণ লিখতে পারবোনা। লেখার মেজাজ বা ইচ্ছেও নেই। খুঁটিনাটি সব লিখতে গেলে প্রয়োজন শত শত পৃষ্ঠার। আবার এমন অবিশ্বাস্য সব ঘটনা আছে, যা হয়তো আপনি কিছুতেই মানতে চাইবেন না। আবু গারিব বা গুয়ান্তানামোর কথা আপনি শুনেছেন, কিন্তু আপনার বাড়ির পাশে এমন মর্মান্তিক জিন্দান থাকতে পারে দুঃস্বপ্নেও হয়তো তা ভাবেননি। কিন্তু প্রতিটি মজলুম এই বাস্তবতার সাক্ষী। ওই সময়গুলোতে যে অভিনব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি, যতো নির্মমতা সয়েছি, শুনেছি-জেনেছি নৃশংসতার যতো গল্প- শব্দে-বর্ণে সেসব উৎকীর্ণ করা কোনোভাবে সম্ভব নয়।

.

।।

সূত্রপাত

২০১৭ সালের এপ্রিল। মাত্র গতকাল বাজারে এসেছে সিরিয়া সিভিল ওয়ার নিয়ে লেখা আমার বই...। আগেরদিন প্রি-অর্ডারের বইগুলো পাঠাতে বেশ ঝক্কি ঝামেলা গেছে। পরদিন তাই সারাদিন বাসায় ছিলাম। বিকেলে বাসার সামনের টঙ থেকে চা খেয়ে গলিতে পায়চারি করছি। এসময় হুট করে কোত্থেকে কয়েকজন এসে চারদিক থেকে আমাকে ঘিরে ধরে। ভিড়ের মধ্যে একজন কোমরে কিছু একটা গুজে দিচ্ছে আচঁ করতে পেরে খপ করে লোকটির হাত ধরে ফেলি। হৈচৈ বেঁধে গেলে এগিয়ে আসে কিছু প্রতিবেশী। পরিস্থিতি বিগড়ে

যাচ্ছে বুঝতে পেয়ে দ্রুত পিস্তল বের করে ভয় দেখায় আগন্তুকেরা। ভড়কে গিয়ে জনতা পিছিয়ে যায়। এ সুযোগে পকেট থেকে 'ডিবি' লেখা আইডি বের করে অপহরণকারীদের একজন। এবার আমার হাত দুটো পিছমোড়া করে হ্যান্ডকাফ লাগায় আর কালো গ্লাসে মোড়ানো একটি গাড়িতে উঠিয়েই শুরু হয় নির্দয়ভাবে পেটানো। 'মিশন হেরোইন' ব্যর্থ হওয়ার শোধ নিচ্ছিল বোধহয়! একটুও টু শব্দ না করে সহ্য করি প্রাথমিক এই আতিথিয়েতা!

.

।।

আয়না ঘরের দিনগুলি

আমার বাসা থেকে নিয়ে যাওয়া ল্যাপটপ, সাথে থাকা মোবাইল, সোশ্যাল একাউন্ট, মেইল সবকিছু তন্নতন্ন করে কয়েকদিন ধরে চলে জ. বানানোর অপচেষ্টা। কিন্তু কোনো ক্লু না পেলে শুরু হয় অন্যধরনের নির্যাতন ও মানসিক হেনস্তা। ঠান্ডাজনিত সমস্যা সত্ত্বেও প্রচন্ড হিটে এসি চালিয়ে একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করা আর বিনোদনের অন্যন্য মাধ্যমে পরিণত করা হয় আমাকে। কিছু সময় পর কোনো এক হর্তাকর্তা আসছে। কিল-ঘুষি আর গালিগালাজের মাধ্যমে পরিচিত হচ্ছি তাদের সঙ্গে। কেউ কেউ সখেদে বলছে, 'কত্ত সাহস!! পুলিশের বিরুদ্ধে স্ট্যাটাস!' ইন্সপেক্টর পদবির একজন চুলের মুঠি ধরে সজোরে থাপ্পড় মেরে বলে, ''ব্যাটা, দ্যাশটা পুলিশের বাপের না, পুলিশের নিজের''।

.

।।

খাস কামরায় খাস লোক

অনিশ্চয়তায় কেটে যায় আরো ক'টি দিন। হঠাৎ একদিন ডাক আসে। যেতে হবে কোর্টে। ডিবির একটি মাইক্রোবাসে উঠিয়ে আদালতে নেওয়া হয়। কী মামলা, কী বিষয়-আশয় তখনো জানি না মাথামুণ্ডু!

.

সারা জীবন কোর্ট-কাচারি এড়িয়ে চলেছি। অথচ তখন দাঁড়িয়ে আছি ম্যাজিস্ট্রেটের খাস কামরায়। আমার সঙ্গে আরো এক আসামি। চুরির মামলা। চোরের ডান হাত আর আমার বাম হাত একই হ্যান্ডকাফে আটকানো। কোমরে মোটা দড়ি ছিল। ম্যাজিস্ট্রেটের কামরায় ঢোকার আগে অবশ্য দড়ি খুলে দিয়েছে। চোরের পক্ষে শুনানি করে তার উকিল। আমার পক্ষে কথা বলবার কেউ ছিলো না। ছিলো না উকিল নিয়োগের সুযোগও।

.

দশদিনের রিমান্ড আবেদন করে সঙ্গে আসা পুলিশ। পুলিশের দেওয়া কাগজ পাতি ঘেঁটে ম্যাজিস্ট্রেট চুপ করে কিছুসময় আমার দিকে চেয়ে থাকে। এরপর জিজ্ঞেস করে, 'স্ট্যাটাস আপনি দিয়েছেন?' 'হ্যাঁ', বলতে জানতে

চায় ঘটনার আদ্যোপান্ত। গুম থেকে শুরু করে এপর্যন্ত যা যা ঘটেছে সব খুলে বলি। সব শুনে ম্যাজিস্ট্রেট খসখস করে ফাইলে কিছু একটা লেখে। এরপর পুলিশের দিকে তাকিয়ে নিরাসক্ত গলায় বলে, 'একদিনের রিমান্ড। সতর্কতামূলক জিজ্ঞাসাবাদ।' আমার দিকে ফিরে আরো দু'বার কথাটা বলে লোকটা। আমি তখন অনুচ্চশব্দে দরুদ-ইস্তেগফার পড়ে চলেছি। হায়েনার ঘেরাটোপে বন্দী অসহায়ত্বের দিনগুলোতে দরুদ-ইস্তেগফারই ছিলো একমাত্র সম্বল। আয়না ঘরে ফিরে এলে সহ-বন্দীরা জানায়, 'সতর্কতামূলক জিজ্ঞাসাবাদের' অর্থ মারধর করতে পারবে না।

.

।।

জামিন অযোগ্য সহজ মামলা!

তেলাওয়াত ও ইস্তেগফারে নির্ঘুম রাত ভোর হয়। পরেরদিন রিমান্ড। সকাল হতে নাম ধরে ডাকে। অমুক পিতা তমুক। আগের রাতে আয়নাঘরে নতুন কিছু অতিথি এসেছে। একজনের চেহারা দেখে মনে হলো আগেও দেখেছি কোথাও। কিন্তু বহু চেষ্টার পরও চেনাজানা কারো সঙ্গে তাকে মেলাতে পারিনি। শান্তশিষ্ট ছেলেটি সারা রাত মগ্ন ছিলো দোয়া ও তাহাজ্জুদে। লোকজন সরে গিয়ে যেতে দেয়। লকআপ থেকে বের হলে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দু'জন দু'পাশ থেকে শক্ত করে ধরে। আয়নাঘর থেকে গন্তব্য সিটিটিসির জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষ। গায়ে হাত না উঠিয়েও কীভাবে কাউকে লাঞ্ছিত ও হেনস্তা করা যায় এখানে মুখোমুখি হই সেসব অভিজ্ঞতার।

.

রিমান্ড শেষ হলে আয়না ঘরে ফেরৎ পাঠানোর আগে এডিসি পুরো বিষয়গুলোর জন্য 'দুঃখপ্রকাশ' করে! বলে, 'সহজ একটা মামলা দিয়েছি। যাতে আপনার দ্রুত জামিন হয়ে যায়।' অবশ্য কারাগারে যাওয়ার আগ পর্যন্ত মামলা সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। কেস কার্ড হাতে এলে দেখি 'তথ্য-প্রযুক্তি আইনের ৫৭(২) জামিন অযোগ্য ধারা'। (পরবর্তীতে বিতর্কিত আইনটি বাতিল হলেও মামলা বাতিল হয়নি। বর্তমানে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা বিচারাধীন।)। ম্যাজিস্ট্রেটের চাহনির মাজেজাও তখন বুঝতে পারি। 'জামিন অযোগ্য' সহজ মামলা!!

.

।।

টাকা দিবি না মামলা খাবি

ব্যারিস্টার মওদূদ আহমদের ল ফার্মের সহায়তায় জামিন মেলে হাইকোর্ট থেকে। মাঝখানে একবার জামিন বাতিলও হয়। জামিনে বেরুলেও শেষ হয় না হয়রানি। এটা ওটা হুমকি-ধমকি। অব্যহত থাকে দফায় দফায় টাকা আদায়। ভাইয়াকে নিষেধ সত্ত্বেও ভ্রাতৃত্বের কারণে শোনতেন না কিছুই। এমনকি একবার ব্যাংক থেকে লোন নিয়েও টাকা দিয়েছিলেন মামলার আইও-কে। আরো মারাত্মক ব্যাপার ঘটতে থাকে। বইয়ের প্রকাশক

এবং ফ্রেন্ডলিস্টের বন্ধু অনেকের কাছ থেকে ওরা হাতাতে থাকে মোটা অঙ্কের অর্থ। টাকা না দিলে নাম উঠবে চার্জশীটে। হয়ে যাবে আসামী!!

.

।।

কিস্তিতে লুটমার

একজন সদ্য ছাত্রত্ব শেষ করেছে। তার কাছে দাবি ৫০ হাজারের। বেচারা মওলানার পক্ষে অতো টাকা দেওয়া সম্ভব ছিল না। পরিবারকেও ভয়ে বলতে পারছিলো না কিছু। ও তখন টুকটাক অনুবাদের কাজ করে। পরে ওই টাকা থেকে তিন কিস্তিতে টাকাটা পরিশোধ করে। শেষের কিস্তি এসআই'র সদ্যজাত ছেলের আকিকার দোয়া পড়িয়ে ১২,৫০০/- দেয়। পঞ্চাশ হাজার পুরো উসুল, সঙ্গে হুজুর দিয়ে মোনাজাত করানোর খরচা থেকেও বেঁচে যায় ওই হারামজাদা!!

.

।।

শেষ হবে লাঞ্ছনা?

জেল খেটেছি প্রায় পাঁচ মাস। আট বছর ধরে দিচ্ছি হাজিরা। ঘুরছি কোর্টের বারান্দায় বারান্দায়। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট পেরিয়ে মামলা এখন সাইবার ট্রাইবুনালে। জুলাইয়ের শুরুতেও হাজিরা দিয়েছি। অসুস্থ শরীর নিয়ে লোহার খাঁচায় দাঁড়িয়ে থেকেছি প্রায় দু'ঘন্টা। সামনে রাখা চেয়ার খালি থাকলেও বসবার অনুমতি নেই আসামীর!

.

নিপীড়ক হাসিনার পতন না ঘটলে হয়তো এবছরই দিয়ে দিতো রায়। সামনে কী হবে জানি না। কেউ বলছে আইন বাতিল হবে। কেউ সংশোধনের কথা। এতে হয়তোবা মামলা বাতিল বা হাল্কা হয়ে যাবে। কী হবে কিছুই জানি না। কোনো কিছুতে আস্থাও নেই। আয়নাঘরে যে শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার হয়েছি, সেই ট্রমা এখনো পুরো সারেনি। আট বছরে মনে হয় না ত্রিশটা দিনও শান্তিমতো ঘুমিয়েছি। এখন কোনোদিন ৩/৪ ঘন্টা ঘুম হলে মনে হয় অনেক ঘুমিয়ে ফেলেছি। মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেছে। মাথার চুল কাঁচা আছে সামান্য। আয়না ঘরে জনৈক শুকরছানা বলেছিল, ''এতো স্মার্ট ছেলে কোত্থেকে ধরে নিয়ে এলো।'' অনেক কষ্টের মাঝেও হাসি পেয়েছিলো তখন। যদিও সেই স্মার্টনেসের কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই আর।

.

পুরো ক্যারিয়ার প্রায় শেষ। প্রকাশনা, প্রিন্টিং বিজনেস, সম্পাদনা, লেখালেখি খেয়ে দিয়েছে সব। শুধু প্রিন্টিং বিজনেসের আট বছরের ক্ষতির হিসাব করলে দুই কোটি টাকা হবে। ''অন্যসময়'' নামে একটি সাময়িকী বের

করতাম। সেটিও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নিজের ও অন্যদের ভালো রাখবার তাগাদায় আলবিদা জানিয়েছি শহুরে জীবনকেও।

.

।।

বদলে যাবে দিন!

ইচ্ছে ছিলো জামিনে বেরিয়ে প্রথমেই একটা সংবাদ সম্মেলন করবো। কিন্তু ততোদিনে অনেক কিছু বদলে গেছে। কাছের মানুষেরা এমন বিহেব করছে, মনে হচ্ছিল আমি এক দাগী আসামি! ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও এড়িয়ে চলছে। যে লেখক ফোরাম বানানো হয়েছিলো লেখকের সুখে-দুঃখে পাশে থাকার, তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করার জন্য, তারাও কোনো কথা বলেনি। কিন্তু এতো কিছুর পরও নিজেকে শক্ত রাখার চেষ্টা করেছি। পরিস্থিতি যা-ই ঘটুক মানসিকভাবে একেবারে ভেঙে পড়িনি। ওরা তো ভাঙতেই চেয়েছে। ওদের সফল হতে দেবোনা পণ করেছি।

.

আয়না ঘরের বন্দীদের কথা মনে পড়তো খুব। এক বৃদ্ধ মওলানাকে দেখেছি ব্লাডপ্রেসার ও ডায়াবেটিসের রোগী। উচ্চ আদালত থেকে জামিন নিলেও মুক্তি মেলেনি তার। জেলগেট থেকে পুণরায় ঠাঁই হয়েছে আয়নাঘরে।

.

খুনী রেজিমের পতন জরুরি ছিলো। বিপ্লব বা স্বাধীনতা যাই বলুন, এটি কেবল প্রাথমিক ফলাফল। একজন মুমিন হিসেবে আমি বিশ্বাস করি, শরিয়ার ছায়াতলে এ ভূমিতে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাই পারে সব শহিদের, সমস্ত নিপীড়ন ও আত্মদানের দায় মেটাতে। আর শুধু তখনি সমাপ্তি ঘটবে দীর্ঘ ক্লান্তিকর এই সফরের। সেদিনটি আসুক, সহসা আসুক আল্লাহ আযযা ওয়ালের কাছে এই শুধু প্রার্থনা।

.

.

(অনেক কিছু স্কিপ করে গেছি। এমনিতে লেখা বড়ো হয়ে গেছে। এই যেমন ধরেন- কখনো কখনো মেরে-টেরে মশকরা করে বলবে, 'কিরে ব্যথা লাগছে?!' তো আপনি কী বলবেন তখন? গলা ছেড়ে হো হো করে হেসে বলবেন, 'না স্যার! খু-উ_ব আরাম পাচ্ছি!'

.

একগ্রুপ মারবে, আরেকগ্রুপ মলম লাগাবে। তৃতীয়গ্রুপটি আপনাকে শুনিয়ে শুনিয়ে নির্যাতনের লোমহর্ষক হরর টাইপ গল্প বলবে। আবার অন্য কেউ এমন ভান ধরবে যেন সে এসবকিছু একদমই পছন্দ করছে না। পারলে সে আপনাকে বাসায় দিয়ে আসে! আসলে এরা সবাই একি দলের বিভিন্ন রোল প্লে করছে। আর এর উদ্দেশ্য আপনার কাছ থেকে তথ্য আদায় বা নিজেদের মর্জিমতো স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারা। জেল-জীবনের গল্প আবার ভিন্ন লেভেলের। জেল-পরিভাষায় 'আমদানি' বা 'অভ্যর্থনা' কক্ষ থেকে এই পাঠশালার হাতেখড়ি। আল্লাহর তৌফিক হলে এই গল্পও কখনো লিখতে পারি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আযযা ওয়াযাল সবাইকে শকুনির বদনজর থেকে নিরাপদ রাখুন, সুস্থ রাখুন, আমিন।)

আয়নাঘরনামা ১৭

(১০ই এপ্রিল'২২)

৮ রামাদান, সবে মাত্র ইফতার করে বের হয়েছি। গন্তব্য স্টারটেক কম্পিউটার এর যার্ম কিনতে যাবো । আমার এক রিলেটিভ আমার জন্য ওয়েট করছেন। মাত্রই বাসা থেকে বের হয়েছি, পেছনে থেকে ডাক আসল, "ভাইই, একটু এদিকে আসেন।" পেছনে তাকিয়ে দেখি তিনজন ব্যক্তি। কাছে যেতেই জিজ্ঞাসা করল,"নাম শাওন কিনা?" আমি হ্যাঁ বলতেই বলল, চলেন আমাদের সাথে যেতে হবে? আমি বললাম, "আপনারা কারা? আমি কেন যাবো?"

উত্তর আসল আপনার সাথে কিছু কথা আছে । আমি বললাম,"এখানে বলেন?" বলে, এখানে বলা যাবেনা । কথা বলতে বলতে সাদা রঙের এক মাইক্রোবাস হাজির। কিছু বুঝে উঠার আগেই মাইক্রোবাস থেকে দুইজন অস্ত্রধারী বের হয়ে আসল।

আমি ভয়ে উঠে যেতে বাধ্য হলাম। মাইক্রোবাসে উঠার সাথে সাথে আমার থেকে ফোন, মানিব্যাগ সব কেড়ে নিয়ে, কালো কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলা হয় । সাথে সাথেই গাড়িতে চড়-থাপ্পর, লাথি শুরু হয় যায়। তখনও আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না আমার অপরাধ কোথায়? আমার সাথে কি হতে যাচ্ছে।

পরে তাদের ইচ্ছেমতো গন্তব্য স্থানে নামানো হয়, লিফটে চড়ে এক রুমে আনা হলো। চোখ খোলে দিলো। চোখ খোলতেই দেখতে পাই, আমি কোন এক অফিসের ভেতরে । নানা ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করা হয়, "আমি এদের চিনি কিনা ? আমি কোন সংগঠন করি ? তাবলীগে কেন গিয়েছিলাম ? দাড়ি রেখেছি কেন? সাদাকা কোথায় করি?" এসব নানান রকম অদ্ভুত প্রশ্ন । তাদের পছন্দ মত জবাব না পেয়ে , চালানো হয় শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার। সারারাত মারধর করার পর সেহরীর সময় চোখ বেঁধে লিফটে করে সিটিটিসির সেই বিখ্যাত সাত তলায় নিয়ে যাওয়া হয়। (অবশ্য তখনও জানতাম না এটা সেই বিখ্যাত সাত তলা)

একা ছোট্ট এক রুমে বন্দী রাখা হয়। সেখানে না ছিল কথা বলার অনুমতি , না ছিল শব্দ করার । এমন নি খাবার পানি চাইলেও অকথ্য ভাষায় গালীগালাজ করা হতো । বাধ্য হয়ে বাথরুমের পঁচা গন্ধ পানি খেয়ে থাকতে হতো। দেয়া হতো নষ্ট পঁচা বাসি খাবার। মাঝে মাঝে তাদের ইচ্ছামত ডেকে এনে বিভিন্ন অপরাধ স্বীকার করার জন্য চালানো হতো শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। সবচেয়ে বেশি অপমানিত হয়েছে আমার দ্বীন। পড়ার জন্য কোরআন চেয়েছিলাম, এই অপরাধে শোনতে হয়েছে গালিগালাজ। এভাবেই কেটে যায় পুরো একশত দিন। এই ১০০ দিনে না আমি জানতে পেরেছি আমার পরিবার কেমন আছে? না আমার পরিবার জেনেছি আমি কোথায় আছি ? আদৌ বেঁচে আছি কিনা? আমার পরিবার এই ১০০ দিন পাগলের খোঁজেছে । আমার বোন, আমার বাবা এমন কোন থাকা, ডিবি অফিস কিংবা র‍্যাব অফিস বাদ রাখেননি। মর্গে মর্গে খোঁজে ফিরেছে আমাকে। জীবনের দুইটি ইদ কাটিয়েছি সেখানে । আমাকে ছাড়া আমার পরিবারের দূর্বিষহ জীবনে কেটেছে। আমার মাকে হারিয়েছি এক বছরও হয় নি, তার মাথায় আমাকে কিডন্যাপ করে তুলে নেয়া হয় ।

একদিন সন্ধাবেলায় আমাকে ডাকা হয়। বলা হয়, "তোর জন্য সুখবর আছে । তুই যা করছোস চাইলে তোকে ক্রস ফায়ার দেয়া যায় । কিন্তু দিব না। তোকে ছোট খাট একটা মামলা দিব। তুই তাড়াতাড়ি ছাড়া পাবি। কিন্তু তোর দিক থেকেও আগায়া আসতে হবে। কোর্টে গিয়ে বলবি; তুই জঙ্গি ছিলি, আর তোকে ধরসে ১৬ তারিখ (১৬ জুলাই) । যদি না বলস তোকে ১০ টা মামলা দিবো , তাও অস্ত্র সহ । ক্রস ফায়ার দিবো।"

এরপর আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় কোর্টে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আজ্জওয়াজালের প্ল্যান ছিলো ভিন্ন। গত ১০০দিনের শারীরিক নির্যাতনে শরীরের যে হালত ছিলো, তাই আমার জন্য রহমত স্বরূপ হয়েছে। ম্যাজ্রিট্রেট আমার শারীরিক অবস্থা দেখেই প্রথমেই জিজ্ঞেস করে," সত্য করে বলো তোমাকে কবে ধরেছে । তোমার শরীরের এই অবস্থা কেনো?" আমি তাকে সব খুলে বললে সে আমাকে অভয় দেয় যে সমস্যা নাই । এরপর আমাকে যারা মামলা দেয় তাদের ডেকে এনে জবাবদিহিতা করে এবং আমার পরিবার কে জানাতে বলে। দীর্ঘ ১০০ দিন পর আমার পরিবার জানতে পারে আমি জীবিত। এরপরেও তাদের কথা অনুযায়ী মিথ্যা না বলায় ম্যাজিস্ট্রের এর কক্ষ থেকে কোর্টের জেলে নিয়ে যাবার সময় আমাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়া চলমান থাকে ।

এরপর জেলে কেটে যায় দীর্ঘ সময় । কোন প্রমান জবানবন্দী না থাকা সত্বেও জামিন পেতে সময় লাগে ৮ মাস । প্রায় এক বছর পর ২৩ সালের ১ম রামাদানে আমি বেরিয়ে আসি । ৮ম রামাদানের বন্দিত্ব শেষ হয় পরের বছর ১ম রামাদানে । এভাবেই কথিত জঙ্গি নাটকের স্বীকার হতে হয় আমাকে । আমার আর আমার ফ্যামিলির উপর দিয়ে যে ঝড় গিয়েছে, আমি চাইনা তার উপর দিয়ে আর কেও যাক । আমি আজও জানিনা কেন আমাকে তারা বন্দী করেছিল ? কি অপরাধ ছিল আমার?

আয়নাঘরনামা ১৮

সন্ধ্যার পর আমাদের সেলের সামনে যেই গার্ড থাকতো। সেই কুলাঙ্গার একরাতে আমাকে এসে ডেকে বললো, উঠ যাওয়া লাগবে আমাদের সাথে। এটা বলেই জমটুপিটা পরিয়ে সেল থেকে বের করে উপরের দিকে নিয়ে যায় । তিনটা ফ্লোর হাটতে হয়েছে।ভিতরে নিয়েই চেয়ারের সাথে বেধে ফেলে।তারপর ওরা আমার চারপাশে বসে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসতে লাগলো।এবং সুন্দর করে বলতে লাগলো, তোরে কিন্তু ক্রস ফায়ার দেওয়ার কথা, আমরা চাই না তোরে হারাইয়া তোর বোন আর মা অসহায় হইয়া পরুক। (ইমোশনাল ব্ল্যাক মেইল করার চেষ্টা করছিল,যাতে আমি গলে গিয়ে তাদের ফাদে পা দেই) আমরা যা বলমু সেভাবে তুই কিছু স্বীকারোক্তি দিবি, তাইলে আমরা অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো। তখন আমি বললাম, আমি কোন মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিতে পারবো না। সত্য হলে সেটা স্বীকার করতে হাজারবার প্রস্তত।

তারপর তারা আমার বাবা মাকে নিয়ে যেসব কথা বললো, আমি শুনে শুনে শুধু কাঁদতেছিলাম। সেদিন যেই পরিমাণ চোখের পানি ঝরছিল। সারাজীবনে কেঁদেও মনে হয় না এতো পানি ঝরছে। গায়ের পাঞ্জাবিটা ভিজে শেষ। অনেক কাকুতি মিনতি করলাম। তারপর চারপাশ থেকে বেধরক কিল গুশি মারা শুরু করলো, কু*** বাচ্চা বেশি সত্যবাদী হইছস? তোর সত্যবাদী দেখাইতেছি বলেই লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হাত পায়ের হাড়গুলো গুড়া করে ফেলার মতো অবস্থা করেছিল। সেদিন হাত নাড়ানোর মতো শক্তিটাও ছিল না। রশি খুলে যখন সেলে নিয়ে যাবে তখন দাড়াচ্ছি না দেখে কান ধরে, দাড়ি টেনে বলছিল ভং না ধরে তাড়াতাড়ি দাঁড়া। আমাদের আরও কাজ আছে। তঁরে দিয়ে আসা লাগবে। কেন দাঁড়াচ্ছি না আবারও মারা শুরু করলো (আমি দাড়াতে পারছিলাম না)। এবার আমি চেয়ার থেকে পরে গেলাম। সেদিন কি হইছিল পরে আমি জানি না আর।

ঘুম ভাঙ্গার পর দেখি আমি সেলের মধ্যে।পুরা শরীরের যন্ত্রণায় কোঁকড়াচ্ছিলাম। গায়ে প্রচুর জ্বর। উঠে বসা তো দুরের কথা এপাশ ওপাশ করার শক্তিও নাই। অনেক কষ্টে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি নিচের ফাঁকা দিয়ে ৩-৪ লোকমা খাওয়ার মতো লাউ সবজি আর পঁচা ভাত দেওয়া। যার বাজে দুর্গন্ধ নাকে আসছিল। তখনই বমি করে দেই।

শরীরে শক্তি না থাকায় খাবার পর্যন্ত হাত নিতে পারিনি। প্রচুর জ্বর আর ব্যাথার তীব্রতায় ঘুমিয়ে গেছিলাম। দুপুরের খাবার দেওয়ার জন্য যখন বাটিগুলো নিতে আসছিল তখনও আমি ঘুমাচ্ছিলাম। সেই খাবারটাই দুপুরে খাওয়ার জন্য বললো। চোখে মুখে পানি ছিটিয়ে ঘুম ভাঙ্গাইছে। কিন্তু বসার মতো শক্তি নাই। হাত পা ফুলে গেছে সব। আমি গার্ডকে চাচা আঙ্কেল বলে অনেক রিকুয়েষ্ট করছিলাম যে, আমাকে একটু ভালো পানি আর ওষুধ কিনে দেন। আমি মরে যাচ্ছি। এটা বলা মাত্রই, জমিদারের বাচ্চা কয় কি! এখানে খাইতে আর ঘুমাইতে আইছস? গোলামের বাচ্চা আবার পানি ওষুধ চায়। আমি ; আঙ্কেল আমি ব্যাথায় মরে যাচ্ছি প্লিজ আঙ্কেল! একটু ব্যবস্থা করে দেন না। কোনোভাবেই তার মন গলানো গেল না।কই দেখি কি হইছে তোর! এসব বলে, যেখানে ফুলে গেছে সেসব জায়গা জোরে জোরে চাপ দিতে দিতে বললো, এসব ব্যাপার না। তুই ভালোই আছস বলে গেটে তালা দিয়ে চলে গেল। শীতকাল, ফ্লোরে পাতলা একটা ছেঁড়া ফাটা কম্বল, তার উপর কম্বলটা

ভিজাইয়া দিয়ে গেছে। একদিকে পচা ভাতের গন্ধ আরেকপাশে বমি করা। ফ্লোরটা ভিজা। সেরাতে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে মনে মনে আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলাম, আল্লাহ আমাকে আজকেই তোমার কাছে নিয়ে যাও, নয়তো ইবরাহীম আঃ- কে যেভাবে নমরুদের আগুন থেকে নিজের কুদরতিতে রক্ষা করেছিলে সেভাবে তোমার কুদরতি শক্তিতে আমার কষ্টটা লাঘব করে দাও।চিৎকার করে কাঁদছিলাম আর আল্লাহকে ডাকিতেছিলাম।

আয়নাঘরনামা ১৯

স্বৈরাচারের আয়নাঘর থেকে মুক্ত এক যুবকের জবানবন্দী!

(এই সম্পূর্ণ ঘটনাটি লিখেছেন মাহদি মাবরুর নামক এক ভাই। এই ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে হবে না। কারণ আমি নিজেও RAB 1 এর আয়না ঘরের ভুক্তভোগী। সময় পেলে আমার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনা গুলোও লিখবো পর্ব আঁকারে ইনশাআল্লাহ। আপাতত এই ঘটনাটি সবার জানা দরকার। এই ঘটনা গুলো ব্যাপক প্রচার প্রসার করা দরকার। দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সকল আয়নাঘরের কবর রচনা করা দরকার। কারণ আমরা চাই, এভাবে যেন আমাদের আর কোন ভাই নির্বিচারে গুমের স্বীকার না হয়। -মাহমুদুল হাসান গুনবী)

.

'RAB এর আয়নাঘরে আপনাকে স্বাগতম'

-

পড়ন্ত বিকেলে যখন পীচঢালা রাস্তা ধরে হাঁটছিলাম। পাশ দিয়ে একটা কালো গাড়ি দ্রুতবেগে অতিক্রম করল। পরক্ষণে আবার মোড় ঘুরে আমার সামনে এসে ব্রেক করল। কিছু বুঝে উঠার আগেই চোখ বেঁধে গাড়িতে উঠিয়ে দ্রুতবেগে স্থান ত্যাগ করল। চোখ খুললে নিজেকে এক নোংরা জলাশয়ের পাশে দেখতে পেলাম। একজন লোক তড়িঘড়ি করে আমার নাকে-মুখে ভিজা গামছা দিয়ে ঢেকে পানি ঢালতে লাগল। পাশ থেকে একজন বলল, 'গাড়িতে যা করলাম, তা প্রাথমিক আপ্যায়ন ছিল। তাতে তুই মুখ খুললি না, শালা কুত্তার বাচ্চা! এখন তোর বাপ বলবে। পিছন থেকে হাতকড়া পরানো হাতে তিন/চারজন লোক চেপে ধরল, কয়েকজন পায়ের উপর চাপ দিয়ে রাখলো। চোখের সামনে যেন মৃত্যু হাতছানি দিচ্ছে।

.

কিছুক্ষণ পরপর প্রশ্নবানে জর্জরিত করছে। মনে হল, এই কষ্টের চেয়ে মৃত্যু অনেক সুখকর। আমার অবস্থা দেখে পাশের একজন বলল, ‘কুত্তার বাচ্চার জন্য গরম পানি দরকার’। এই বলে পানি ঢালার সময় আরো বাড়িয়ে দিল। মনে হচ্ছিল, মৃত্যু নিশ্চিত। মৃত্যুর সম্মুখীন হলে শরীরে এত শক্তি কোথা থেকে আসে আল্লাহ ভাল জানেন। আমার শরীরের ঝাঁকুনিতে তিন/চার জন লোক হাত ছেড়ে একে অপরের উপর পড়ে গেল। এভাবে চলছিল জীবন-মরণ পরীক্ষা।

.

মুমূর্ষ অবস্থায় চোখ বেঁধে নিয়ে চলল অজানা গন্তব্যে। চোখ খুলে নিজেকে খুঁজে পেলাম ঘুটঘুটে অন্ধকারে। ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীর এপাশ-ওপাশ করতে ব্যথা হচ্ছিল। এ অবস্থায় ঘুমানোর ইচ্ছা করছিলাম। এমন সময় বৈদ্যুতিক বাতির ঝাঁঝালো আলোতে ঘুমের সাধ মিটে গেল। সাথে সাথে রুমের ভিতর কয়েকজন সদস্য ঢুকে টেনে তুলল। হাত-পা বেঁধে একটি কাঠের ফ্রেমের মধ্যে হাত ও পায়ের ফাঁক দিয়ে লাঠি ঢুকিয়ে ঝুলিয়ে দিলো। মাথা নীচের দিকে ঝুলছে, পায়ের গোড়ালি ও নিতম্ব একসাথে আটসাঠ হয়ে লেগে আছে।

.

আগ্রাসী পদক্ষেপে বুটের শব্দতুলে অফিসার গোছের ২জন লোক সাথে কয়েকজন সিপাই নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। সবাই ইউনিফর্ম পরিহিত। বুঝতে কষ্ট হলনা এরাই হচ্ছে দেশের কুখ্যাত এলিট ফোর্স (RAB)। অফিসার গোছের লোকটি বিকট শব্দে চেঁচিয়ে উঠল। হাঁটু, পায়ের তলা ও নিতম্বে আঘাতের পর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। 'হারামজাদা! এখনো সময় আছে স্বীকার কর, প্রাণ রক্ষা পাবে’। এভাবে কত সময় কাটল বলতে পারি না।

.

যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখি, টাইলস করা মেঝেতে হালকা বেডের উপর শুয়ে আছি। সেই কর্দমাক্ত স্যাঁতস্যাঁতে কক্ষ উধাও। কানে মৃদু আওয়াজ এলো। ধমকের সুরে কেউ বলছে- তার সাথে এমন আচরণ করলে কেন? ইত্যাদি- ইত্যাদি। সাথে সাথেই একজন অফিসার পাশে দাঁড়ানো দেখতে পেলাম। সে আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল। ভাবখানা এমন যে, কেউ আমার সাথে অন্যায় করে ফেলেছে। আমাকে বলল, ‘তোমার কিছুই হবে না, তুমি শুধু আমাদের একটু সহযোগিতা কর। তুমি দেশের নাগরিক, তোমার উপর যে জুলুম করেছে তারও বিচারের ব্যবস্থা আছে।’ নানা কথা বলে আমাকে কনভেন্স করার চেষ্টা করল। অতঃপর অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার কঠোর নির্দেশ দিয়ে চলে গেল।

.

আভিজাত্যের ছোঁয়ায় পরিপূর্ণ কক্ষ দেখে মনে হল কোন অফিস। মানসম্মত খাবার, কত সুন্দর ব্যবহার! যেন পাঁচ তারকা হোটেলকে হার মানাবে। এখন শরীর একটু সুস্থ লাগছে। দুজন যুবক এসে আমাকে অন্য একটি রুমে নিয়ে গেলে। চেয়ারে বসা সেই অফিসারটি সহাস্যে জানতে চাইল আমি কেমন আছি, শরীরের অবস্থা

কেমন। সব শুনে বলল, ‘তুমি চিন্তা করো না। তোমার মা-বাবা সবাই ভাল আছে, আর একটু সুস্থ হও তখন বাড়ি যেও। তবে বাড়িতে না গিয়ে বিদেশে চলে গেলেই ভাল হবে। তোমাদের সপরিবারে বিদেশে চলে যাওয়ার সব ব্যবস্থা আমি করে এসেছি, এই দেখ বিমানের টিকেট। পাসপোর্টের ঝামেলা বিশেষভাবে সমাধান করেছি। ঊর্ধ্বতন অফিসারের নিকট আমি তোমার ব্যাপারে সব বলে এসেছি। তাছাড়া নিরপরাধ ও অনুতপ্ত নাগরিকের ব্যাপারে সরকারও আন্তরিক। তুমি নির্ভয়ে আমাকে সব বলতে পার।

.

এখন যে রুমে বসে আছি রুমটি পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন। তবে চারদিকে হাড়গোড়, কংকাল, ভয়ানক সব নির্যাতনের চিত্র ও উপকরণে সাজানো রয়েছে। দূরের কোনো স্থান থেকে আর্তচিৎকারের শব্দ ভেসে আসছে। সব দেখে ক্ষণিকের সুখ নিমেষে হারিয়ে গেল। তুমি কি ভাবছ? অফিসারটির কণ্ঠ শান্ত। আমার নির্বিকার ভাব দেখে আমাকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করল, ‘তুমি যদি সত্য প্রকাশ করতে না চাও, মনে রেখ সত্য প্রকাশ না করে উপায় নেই। তোমার ও তোমার পরিবারের সুখ-দু:খের বিষয়টি ভেবে দেখার দায়িত্ব তোমার। আমি কথা দিচ্ছি তোমার ভবিষ্যৎ, সব বিষয় আমরা ভেবে দেখব’। এভাবে মিথ্যাকে সত্য হিসাবে স্বীকার করতে চাপ দিচ্ছিল।

.

আমি সোফার মধ্যে বসে আছি এমন সময় কয়েকজন যুবককে নিয়ে আসা হল। সবার চেহারায় নির্যাতনের ছাপ স্পষ্ট। পূর্বপরিচিত দুয়েকজন ব্যতীত কাউকে চিনতে পারলাম না। দুজন যুবক আমাকে সনাক্ত করল এবং তাদের উত্তর শুনে অফিসারটি সন্তুষ্ট হল। অফিসারটি বলল, ‘দেখ, তোমার ব্যাপারে আমরা সবই জানি। তবুও আমি চাই তুমি তথ্য দিয়ে অনুতপ্ততা প্রকাশ কর। আমাকে কতগুলো ছবি দেখিয়ে, আমার সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি প্রমাণ করতে চাইল। সবচেয়ে খারাপ লাগল যখন যুবকেরা ধোঁকায় পড়ে আমার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি দিল।

.

অফিসারটি বললো, ‘ঠিক আছে তোমাকে কিছুই বলতে হবে না, শুধু এই কাগজে সই কর’। আমার 'না বোধক' উত্তরে অফিসারটি স্বমূর্তি ধারণ করল। তার সুন্দর ব্যবহার উবে গেল। আসল চেহারা প্রকাশ পেল। কয়েকজন সিপাহী আমাকে ধরে ফেলল, অন্য একটি চেয়ারে বসিয়ে আটকে দিল। শুরু হল নির্যাতনের নতুন অধ্যায়। মাথা ঘুরতে লাগল। চেয়ারসহ আমি ঘুরছি, মনে হচ্ছে কেউ আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি অজ্ঞানপ্রায়। দফায় দফায় চলল নির্যাতন।

.

যখন জ্ঞান ফিরল দেখলাম আমি অন্ধকারে পড়ে আছি। একটু অনুভূতি জাগতেই আঁতকে উঠলাম। হাত দিয়ে দেখি পরনে কোন কাপড় নেই। আলো জ্বলতেই অন্য কোথাও সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় স্যাঁতস্যাঁতে কক্ষে নিজেকে আবিষ্কার করলাম। এ অবস্থায় নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলাম না। দু’চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরতে

লাগল। এলিট ফোর্সের (RAB) কয়েক সদস্য এগিয়ে এসে আমাকে উঠে দাড়াতে বলল। লজ্জায়, অপমানে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।

.

আবার জেরার উপর জেরা। হাতে পায়ে ইলেকট্রিক শক দেয়া শুরু করল। একজন শয়তান এসে মেটাল ডিটেক্টরের মত একটা যন্ত্র দ্বারা লজ্জাস্থানে ইলেকট্রিক স্পার্ক দিতে লাগল। আল্লাহকে খুব স্মরণ করছি। হায়রে দুনিয়া। এটা নাকি মুসলিমদের দেশ। হঠাৎ করে পেছন থেকে লাথি দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিল। আবারও শক দিতে লাগল, হাত পায়ের আঙ্গুল অবশ হয়ে এল, কালো রং ধারণ করল। দুজন লোক ক্রমাগত আমাকে লাথি মারতে লাগল। শরীরের বিভিন্ন স্থান দিয়ে রক্ত ঝরতে শুরু করল। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শরীর কাঁপছে, পানি চাইলে পানি দিচ্ছি বলে গায়ের উপর প্রস্রাব করে দিল।

.

এরই মধ্যে একজন যুবককে আমার রুমে নিয়ে এলো। ছেলেটি শুধুই কাঁদছে। ওরা চলে গেলে তার সাথে কথা বলতে চেষ্টা করলাম। কান্নার জন্য কথা বলতে পারছিল না সে। আমি তাকে সান্ত্বনা দিতে চাইলে বলল, ‘সব শেষ হয়ে গেছে। এখন আর সান্ত্বনা দিয়ে কি লাভ।’ বলতে লাগল, তার ভাইকে বাড়িতে না পেয়ে তাকে সাদা পোশাকের কিছু লোক ধরে নিয়ে আসে। নির্যাতন করতে করতে বড় ভাই কোথায় তা জানতে চায়। না বললে কিছুক্ষণ পর মা-বাবা ও বোনকে ধরে নিয়ে আসে। তাদের সামনে আমাকে এবং আমার সামনে তাদেরকে নির্যাতন ও জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে পরিবারের একজন আমার কাছে এ ব্যাপারে তথ্য রয়েছে বলে জানায়।

.

আমি বলতে না চাইলে তারা আমার পোশাক খুলে নেয়। একজন লাথি দিয়ে বাবাকে আমার উপর ফেলে দিয়ে বলাৎকার করতে বলে। নাহলে, মা বোনদের সামনে শ্লিলতাহানীর হুমকি দেয়। বাবার কাপড়-চোপড় আমার চোখের সামনে খুলে নেয়। আমি জানিনা দুনিয়াতে এর চাইতে কঠিন ও ঘৃণিত পরিস্থিতি সম্মুখীন কাউকে হতে হয়েছিল কিনা? আমি আর সহ্য করতে পারিনি। যখন বাবা আঘাতের পর আঘাতে জর্জরিত হয়ে আমার সামনে অসহায়ের মত আসলেন। আমি চিৎকার দিয়ে বললাম ‘আমি সব জানি, সব বলব, শুধু আমার মা বনোদেরকে যেতে দিন।‘ একজন সামনে এসে সব রেকর্ড করে নির্দিষ্ট জায়গায় মেসেজ পাঠালো। তাদেরকে যেতে দিয়ে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

.

চোখ দুটো ক্লান্তিতে বুজে আসছে। কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম বুঝতে পারি নি। হঠাৎ কে যেন মুখে বুট দিয়ে লাথি মারল, সাথে সাথে পা বেঁধে মাথা নীচের দিক দিয়ে ঝুলিয়ে দিল। হাতে বৈদ্যুতিক শক দিতে আরম্ভ করল। মাথা ঝিমঝিম করছে। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরলে পানি খেতে চাইলাম। অফিসারের অনুমতি নিয়ে পানি দেয়া হল।

.

এখন আমি অন্য কোথাও আছি বলে মনে হল। পাশে বেশ সুঠাম দেহের দুজন তরুণ পড়ে আছে। হাত দিয়ে লজ্জাস্থান ঢাকার চেষ্টা করছে। কথা বলার কোনো সুযোগ পেলাম না। যাতে না ঘুমাতে পারি, ঝুলিয়ে রাখল হাতকড়া পরিয়ে। সবার পা ফাঁক করে পেছনে আলাদা আলাদা দু'টো খুঁটির সাথে বেঁধে রাখল। মাথায় ও শরীরে বিভিন্ন স্থানে অসহ্য ব্যথা অনুভব করলাম। কিছুক্ষণ পর এ অবস্থায় ঘুম আসতে চাইলে ইলেকট্রিক শক দিতে আরম্ভ করল। রাত-দিন এভাবে (রাত-দিন বুঝিনি অনুমান করে হিসাব করতাম) চলতে থাকলে মানসিক ভারসাম্য হারানোর উপক্রম হল। দিনের পর দিন। চলছে তো চলছেই। যেন এর শেষ নেই।

.

এবার আমাকে একটা ছোট রুমে দাড় করিয়ে রাখল। একসুতা নড়াচড়া বা বসার সুযোগ নেই। মনে হল এর চেয়ে ঝুলন্ত অবস্থায়ই ভাল ছিল। এ অবস্থায় কিছু শুকনা রুটি খেতে দিল। খেতে পারছি না দেখে পানি এনে দিল। পানি ও রুটি খেতে কষ্ট হল না। এখন আর ঘুম ধরে রাখতে পারছি না। ঘুমানোর চেষ্টা করলাম মাত্র হঠাৎ মাথার উপর বিকট শব্দ করে ধারালো ও তীক্ষ্ণ সুচাগ্র মাথা বিশিষ্ট লোহার থাম নীচের দিকে আস্তে আস্তে নামতে দেখলাম। ভয়ে আর্তচিৎকারে থামটি থেমে গেল। মনে মনে স্থির করলাম এ অবস্থা থেকে মৃত্যুই শ্রেয়। আবার ঘুমাতে চেষ্টা করলাম। সাথে সাথে আবার বিকট শব্দ। এবার আমি চুপ থেকে শেষ দেখার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু থামটি যতই নীচে আসছে শরীরের রক্ত ততই লাফাতে শুরু করল।

.

আমি আর পারছি না, ঘুমাতে দিচ্ছে না, জেগে থাকাও সম্ভব হচ্ছে না। আর কত নির্ঘুম থাকতে হবে। বুটের শব্দ শুনে সামনে তাকিয়ে দেখি কয়েকজন ঊর্ধ্বতন অফিসার। আমাকে স্বীকারোক্তি দিতে এবং তাদের সাহায্য করতে বলল। আমি অসম্মত হলে আরো ভয়াবহ পরিণতির কথা জানালো। আমি আর চোখের পাতা ধরে রাখতে পারলাম না। সাথে সাথে চোখের পাতার উপর তীব্র আলো পড়ল। চোখ বন্ধ করেও লাভ হল না, আলোর তীব্রতা মাথা ভেদ করবে বলে মনে হচ্ছিল। ছোট্ট পাইপ সদৃশ জায়গায় দাড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ফেটে রক্ত ঝরবে বলে মনে হচ্ছিল। আর পারলাম না, সব বলতে রাজী বলে জানালাম তবে আগে ঘুমাতে চাই। সেই স্থান থেকে নামাতেই ফ্লোরে পড়ে গেলাম।

.

'RAB থেকে ডিবি পুলিশঃ আয়নাঘর থেকে টর্চারসেল'

--

ঘুম থেকে জেগে দেখি আমি পোশাক পরিহিত। আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করে আজকের গ্রেপ্তার দেখিয়ে রিমান্ড চাইল। তা মঞ্জুর করে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে আমি কিছু জানি না বলে জানালাম। নির্যাতনের নব সূচনা উন্মোচিত হল। পুলিশের লোকজন আমাকে একটি চৌবাচ্চায় ছেড়ে দিল।

তিন/চার ফুট নীচে পাইপ সদৃশ চৌবাচ্চার তলায় পা ঠেকল। সাথে সাথে বিষধর সাপের মত বিষাক্ত কিছু দংশন করতে লাগল। বুঝতে পারলাম শিং মাছ কাটা ফুটাচ্ছে। আর্তচিৎকারের সাথে সাথে জ্ঞান হারালাম।

.

পায়ের ক্ষত এখনো আগের মতই। চোখ বেঁধে অজানার উদ্দেশ্যে নিয়ে চলল। যখন থামল নিঝুম রাত। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা তার উপর লজ্জা নিবারণের মত কোনো কপড় নেই। হঠাৎ আলো জ্বলতেই ইউনিফর্ম পরিহিত একজন মহিলা অফিসার, সাথে কয়েকজন মহিলা সিপাহী নিয়ে প্রবেশ করল। স্পর্শকাতর অঙ্গে খুঁচিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে লাগল। আল্লাহর কাছে এই ফিতনা থেকে মনে প্রাণে আশ্রয় চাইলাম। অফিসার চলে গেলে মেয়েগুলো উত্যক্ত করতে আরম্ভ করল। আল্লাহর কাছে সকাতরে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই অশ্লীল ফিতনা থেকে মু'মিনদের রক্ষা করেন। ভাবতে অবাক লাগে উপরের আদেশে হুকুমের গোলামরা কতটা নীচে নামতে পারে। কখনো ৪ জন আবার কখনো ৬ জন নিজেদের পোশাক উন্মুক্ত করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উত্যক্ত করে চলল।

.

প্রস্রাবের রাস্তায় নল ঢুকিয়ে, বৈদ্যুতিক স্পার্ক দিয়ে, প্রস্রাব না করতে বাধ্য করে, শরীরের অনুভূতির স্থানে বিপদজনক স্পর্শ দিয়ে ধ্বংসাত্মক আবেদন তীব্র করতে মানুষিক নির্যাতন অব্যাহত রাখল। ঠাণ্ডার প্রকোপ নেই মনে হচ্ছে এখন। আস্তে আস্তে কক্ষ গরম হচ্ছে। তবে উত্তেজক গান বাজনা অব্যাহত রইল। একজন তরুণী একাকী অবস্থান করছে। আমি তার বেইজে নাম দেখে নিশ্চিত হলাম সে মুসলিম ঘরের সন্তান। উপদেশমূলক কিছু মর্মস্পর্শী কথা বলে তার বিবেক জাগ্রত করতে চেষ্টা করলাম। আল্লাহর ইচ্ছায় ক্ষণিকের জন্য হলেও তার বিবেক জাগ্রত হল। প্রশ্ন করায় সে জানাল, 'আপনাদের কাবু করতেই পুরুষদের উত্যক্ত করতে নারীদের এবং নারীদের উত্যক্ত করতে পুরুষদের ব্যবহার করা হয়।'

.

পরবর্তীতে জানতে পারি, অনেকের সম্মুখে নিজ সম্মানিত মা-বোনদের অশ্লীল হয়রানী করা হয়, যা দেখে কোনো সন্তান, ভাই, বাবা স্থির থাকতে পারে না। ঘৃণিত পন্থায় তথ্য উদঘাটন করতে এদের বিবেকে বাধে না। হে আল্লাহ! আমাদের অসহায়ত্ব তোমার কাছে নিবেদন করছি। নিশ্চয়ই তুমি মাজলুমের দোয়া কবুল করে থাক। রাগে দু:খে পাগল প্রায় হয়ে গেলাম। তাদের কথায় রাজি না হলে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছিল। শরীর আর ফুলের আঘাতও সইতে অক্ষম। কাপড়-চোপড় হীন এভাবে বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব।

.

চোখ বেঁধে অন্য কোথাও নিয়ে গেল। বুঝলাম বেশী দূরে নেয়নি। চোখ খুলে যা দেখলাম তা বর্ণনা করা অসম্ভব। এই মুসলিম জনপদে মানুষ মানুষের সাথে এত নিকৃষ্ট ও জঘন্য আচরণ করছে যা অতিকল্পনাপ্রবন মানুষও ভাবতে পারবে না। সারা শরীর কাঁপছে, বাকরুদ্ধ হয়ে আসছে।

.

অনেকেই পড়ে আছে, সবাই বিবস্ত্র। অজানা কোন জায়গায়। যার নাম এরা দিয়েছে ইন্টারোগেশন সেল। এই হল জিজ্ঞাসাবাদের স্বরূপ। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘুম তদুপরি শারীরিক-মানসিক নির্যাতনে অতিষ্ঠ সবাই। কাউকে আবার গ্রেপ্তারের পর বারুদ ঢেলে হাত, দাড়ি, শরীর পুড়িয়ে দিয়েছে। অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে পা গুড়িয়ে দিয়েছে। চিকিৎসার নামে সামান্য আহতদের হাত-পা কেটে পঙ্গু করেছে। আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি আয়রন কাটারের ভোতা অংশ দিয়ে টেনে টেনে নাবীর সুন্নাহ দাড়িকে উপড়ে ফেলা হয়েছে, আমি নিজেও এর ভুক্তভোগী, অথচ দাড়ি রাখা আমাদের জন্য ওয়াজিব।

.

সপ্তাহের পর সপ্তাহ ঝুলিয়ে রেখেছে। নখ উপড়ে ফেলেছে। বিবস্ত্র করে শরীরের স্পর্শকাতর ও অতি স্পর্শকাতর স্থানগুলোতে মোমবাতির উত্তপ্ত ফোঁটা ফেলে ধীরে ধীরে অর্ধসিদ্ধ করা হয়েছে। দুটো মই উপরে নীচে রেখে পিষে ফেলা হয়েছে। অনেককে ছোট একটি রুমে লোহার একটি চেয়ারে বসিয়ে হাত, পা ও শরীর বেঁধে ফেলে, হাই ভোল্টেজের বাল্ব মাথার উপরে ও চারিদিকে এত কাছে রাখে, মনে হয় সেখানে সহজেই পানি ফুটবে।

.

আসামীদের একটি লোহার পাত্রে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে প্রস্রাব করতে বাধ্য করা হয়। এতে পুরুষাঙ্গ দিয়ে রক্ত বের হয়ে আসার উপক্রম হয় এবং কখনো রক্ত বেরিয়ে আসে। হাতে তারকাটা মেরে গাছে অথবা খুঁটিতে ঝুলিয়ে রাখার পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। হাত পায়ের আঙ্গুলে সুই ঢুকানো হয়। শরীরের বিভিন্ন স্থানে দফায় দফায় বৈদ্যুতিক শক দিয়ে প্রায় পুড়িয়ে ফেলা হয়। সুতি কাপড় বা তোয়ালে তরল পদার্থ অথবা পানিতে ভিজিয়ে তা দিয়ে সম্পূর্ণ মাথা মুড়িয়ে তারপর পানি ঢালা হয়, এতে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। যা ছিল অত্যন্ত কঠিন।

.

নির্যাতন নিপীড়নের সবগুলো কথা লিখতে পারলে আগামী প্রজন্ম জানতে পারত, সঠিক ইতিকথা। কোথায় এদের মানবতা? কোথায় এদের প্রতিশ্রুতি? কোথায় এদের মানবাধিকারের শ্লোগান? কোথায় এদের আইন ও সংবিধান? সব ফাঁকা বুলি।

.

যাইহোক, অবস্থা দেখে বুঝলাম নতুন কোন ফন্দি এটেছে মানুষ নামের এই জানোয়ারগুলো। আমাদের গতিবিধি মনিটরিং করা হচ্ছিল। আবেগ তাড়িত হয়ে কিছু করলে তার সূত্র ধরে আবার জেরা। তবুও একজন ঝুঁকি নিয়ে ইংগিতে জানালেন তাদের দেওয়া পানি না খেতে বা কম খেতে। কারণ পানিতে হাই পাওয়ারের ঘুমের ঔষধ মেশানো আছে। এখন সব পরিষ্কার হয়ে গেল কেন শুকনা রুটির সাথে পানি দিয়েছিল। পানি খাওয়ার পর কেনইবা ঘুম বেড়ে যেত দ্বিগুণ।

.

চিন্তার রেশ না কাটতেই ইউনিফর্ম পরিহিত কয়েকজন নারী-পুরুষ অফিসার ও সিপাহীর বুটের শব্দে পরিবেশ ভারী হয়ে উঠল। কাগজ কলম দিয়ে সই করতে বলা হল। আমি বললাম, আনীত অভিযোগ সব মিথ্যা। আমি মিথ্যার স্বাক্ষী হব না। নির্যাতনের নতুন মাত্রা যোগ হল।

.

সুঠাম সুদর্শ একজন সিনিয়র যুবকের উপর পাশবিক অত্যাচারের হুমকি দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিল। কয়েকজন হায়েনা হাত বেঁধে বুট দিয়ে পা চেপে ধরল। ক্রোধে শরীর কাঁপছে কিন্তু কেউ তো বন্ধন মুক্ত নয়। কী করব? কিংকর্তব্যবিমূঢ়! শুরু হল আরেক অধ্যায়। হুমকি, প্রহার, বৈদ্যুতিক শক কাজ হল না দেখে নিকৃষ্ট এক শয়তান মুদ্রণ অযোগ্য ভাষায় গালি দিয়ে বলল, ‘তোর স্বাক্ষী দিতে হবে না, তোর "বাবাকে” বলাৎকার কর। তা না হলে কারো রেহাই নেই’। এই বলে আমাকে তার উপর চেপে ধরল। আল্লাহু আকবার বলে উচ্চস্বরে হুংকার দিয়ে গড়িয়ে পড়লাম। বললাম, ‘আমি সই করব, তবে আগে কাপড় পড়তে দিন’।

.

আমাকে চোখ বেঁধে অন্যত্র নিয়ে চলল। জানিনা অন্যদের ভাগ্যে কি হল। সেখানের পরিবেশ দেখে নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করলাম। বলল, কি কি বলে আমাদের সহযোগীতা করতে পারবে বল, তোমার কোনো ভয় নেই।’ আমাকে নীরব দেখে আবারও প্রলোভন দিল। একজন নরপশু এসে আমার গলায় কাপড়ের তৈরী ভিজা প্যাড শক্ত করে গলায় পেঁচিয়ে দিল। যখন নিশ্চিত হল আমি তাদের ধোঁকা দিয়েছি, সাথে সাথে কাপড়ের ভিজা প্যাডে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হল। বাকরুদ্ধ, মুমূর্ষ, এক জীবন্ত এক লাশ!!! “হে আল্লাহ তুমি আমাকে যে সাহায্য করবে আমি তার কাঙ্গাল। আমার অসহায়ত্ব আমি তোমার কাছেই নিবেদন করছি। আমাকে এবং সকল মু’মিনকে তুমি ক্ষমা কর। মহা ফিতনা থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দাও। সকলের জন্য উত্তম ব্যবস্থা কর। হে আল্লাহ! আমার পরিবার পরিজনদের আমি তোমার কাছে সোপর্দ করলাম। জালিমের হাতকে তুমি সংযত কর। তাদের মধ্যে তুমি অনৈক্য তৈরী করে দাও। এদেরকে তুমি ধ্বংস কর।

.

রক্তাক্ত এবং সংকটাপন্ন অবস্থায় আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করা হল। ইশারায় জানালাম আমি স্বীকারোক্তি দিতে অসম্মত, অপারগ। বেঞ্চ থেকে আমাকে লাথি দিয়ে ফেলে দিলে মুখে রক্ত জমে যায়। অবস্থার অবনতির আশংকায় আমাকে অবশেষে কারাগারে প্রেরণ করল।

.

'ডিবির টর্চার সেল থেকে কারাগারে'

--

মৃতপ্রায় শরীর নিয়ে আমাকে অনেক পুরনো নোংরা দুটি কম্বলে শুতে দিল। কারাগারের হাসপাতালের বিশেষ সুবিধা বঞ্চিত করে একাকী এক রুমে থাকতে দিল। দীর্ঘ দিন অসুস্থ থাকার পর আল্লাহর অশেষ রহমতে শরীর সুস্থ হতে লাগল। কারাগারে অনেককে গুরুত্বর জখম নিয়ে বিনা চিকিৎসায় পড়ে থাকতে দেখে নিজের দু:খকে তুচ্ছ মনে হল। কারগারে দেখলাম আসামীদের জন্য যে সাধারণ মর্যাদা দেয়ার নিয়ম দ্বীনদারদেরকে তা দেয়া তো দূরের কথা সার্বক্ষণিক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের পাত্র হয়ে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে।

.

অনেক অল্প বয়সী তরুণ দ্বীনের প্রতি অনুরাগীদেরকে দুর্ধর্ষ আসামীদের পাশে থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে। তাদের নিকৃষ্ট পাশবিক যৌন নির্যাতন থেকে বাঁচতে কোমলমতি ছেলেদের রাতের পর রাত নির্ঘুম কাটাতে হচ্ছে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে কত জন যে প্রশাসনের লাঠিচার্জের সম্মুখীন হয়েছে তার হিসাব নেই। সামান্য উনিশ-বিশ মনে করলে বেঁধে হাঁটু, পায়ের তলা, নিতম্ব ইত্যাদি জায়গায় আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে বিভিন্ন কারাগারে চালান দেয়া হয়েছে, বিদ্রোহী টাগ দিয়ে। তথাকথিত আইনি সহায়তা, ডিনাই পিটিশন করতে দেয়া হয়নি। জেলে প্রবেশের পরে প্রথম দিকে দীর্ঘদিন দেখা সাক্ষাতের মৌলিক অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়। এমন অনেক জেল যেখানে ঈদের সময়ও দেখা করতে দেয়া হয় না। বাবা-মায়ের দেয়া টাকা পয়সা অনেক সময় কারা কর্তৃপক্ষ আত্মসাৎ করে।

.

শালীনতা বহির্ভূতভাবে প্রায়ই তল্লাশির নামে হয়রানী করা হয়। ধূমপায়ী, মাদকাসক্ত, নিকৃষ্ট আসামীদের সাথে থাকতে বাধ্য করা হয়। দিনরাত পায়ে ডাণ্ডাবেড়ী পরিয়ে রাখে। গুরুত্বর অসুস্থ উলামা-তলাবা-দ্বীনদারদেরকে কোনোরূপ চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে না। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনে অনেকে পঙ্গুপ্রায় এবং মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে আছেন। বিনা চিকিৎসায় মারা যাওয়া অনেকেকে হার্ট অ্যাটাক বলে চালিয়ে দিচ্ছে।

.

দিনরাত সামরিক নজরদারীর মত নিয়ন্ত্রিত বিধি অনুসরণ করতে হয়। লেখা পড়ার মৌলিক অধিকারও ছিনিয়ে নিয়েছে। একটি কলম গেলেও অনেককে লাঠির আঘাত করতে নির্দেশ দেয়। সামান্য ছুতা ধরে কালো জম টুপি পরিয়ে রাখা হয়, চোখ বেঁধে আসামীদের সামনে ঘোরানো হয় এবং হ্যান্ডকাফ পরিয়ে উঁচু গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

.

বিনা অপরাধে বছরের পর বছর বন্দী করে হচ্ছে। আদালতেও পাঠানোও হচ্ছে না। সার্বক্ষণিক নিকৃষ্ট আচরণ অব্যাহত থাকে। অন্য আসামীদেরকে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়। বিরোধ মারাত্মক আকার ধারণ করলে প্রশাসন তখন তাদের পক্ষাবলম্বন করে উল্টো নির্দোষদের শাস্তি দেয়। দু’একজন ইসলামি মাইন্ডের

জেল সুপার যদি ভালো আচরণ করে তবে তাদের বিভাগীয় পর্যায়ে শোকজ করা হয়। তবে এদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। অবশ্য তারা দ্বীনদারদের আখলাকে মুগ্ধ হয়েই ভাল ব্যবহার করে।

.

বিবেক সম্পন্ন মানুষ নির্যাতন সহ্য করতে হলেও সম্মান হারাতে চায় না। আর সম্মানিত ব্যক্তিদের বছরের পর বছর অপমান ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যই যেন নিত্যসঙ্গী। হে আল্লাহ! তুমিই আমাদের একমাত্র অভিভাবক, তুমিই সাহায্যকারী। তুমিই শিশু মুসার প্রতিপালক। তুমিই আজিজুল হাকিম, আর আমরা তোমার পথে মাজলুম। হে আল্লাহ। হে উত্তম ব্যবস্থাপক। আমাদের ক্ষমা কর, তোমার পথে যারা অগ্রণী তাদের সঙ্গী কর। ঈমানের পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি কর।

আয়নাঘরনামা ২০

উত্তরায় র‍্যাব ১ এর বিতরব একটি ভবন আছে সেখানের তিন তলায় গুমখানা রয়েছে। যেখানে নিরীহ আলেম ও সাধারণ মানুষদের নিয়ে গুম রাখা হয়।

.

আমাকেও সেখানে গুম রাখা হয়েছিল , এখানে একটি বড় জেনারেটর ছিলো এর সাথের সেইলে আমাকে রাখা হয়েছিল ২৪ ঘন্টা চোখ বাধা এবং হেন্ডকাপ পড়া অবস্থায় আমার হাতে ঘা হয়ে গিয়েছিলো।

.

মাথায় বড় বড় উকুন বাসা বেধে ছিলো।আমার সৃতিশক্তি নষ্ট করে ফেলেছে এখন সাধারণ কিছু মনে রাখতে পারি না চেনা মানুষ কে ও ভুলে যাই বিষন ভাবে ভুলে যাই অনেক চেষ্টা করে মনে করতে হয়।

.

আমাকে তারা শুধু নির্যাতন করে শান্ত হয় নাই আমাকে দুইবার ক্রস ফায়ের দিবে এমন নাটক সাজিয়েছিলো। তাদের মেইন হেড কোয়াটার হচ্ছে এয়ারপোর্টের রাস্তা দিয়ে বিতরে।

.

শেষ বার যখন আমাকে ক্রস ফায়ার দিবে বলে আমাকে রাতে নিয়ে যায় সেইদিন রাতে আমাকে ভয় ভীতি দেখিয়ে একজন নিরাপদ মানুষ কে গ্রেফতার করে, একজন আলেম কে গ্রেফতার করে শুধু মাত্র তার ফোন নাম্বার আমার কাছে ছিলো আর তার নামের শেষে জিহাদী তাই। সেই দিন রাতে ফিরার সময় তারা সবাই

যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন চখের কাপড় শরিয়ে দেখেছিলাম কোথায় আমাদের রেখেছিলো। আর ও অনেক ভয়াবহ সৃতি আছে।

নবেম্বরের ১৪ তারিখ এশার সলাত পড়ে চাচার সাথে ব্যাবসায়ীক আলোচনা করছি এর মধ্যে লক্ষ করলাম একটা

Higlac গাড়িতে কিছু সিভিল পোশাক পরা কিছু লোক আমাদের কাছে আসছে।

কাছে এসে আমার চাচাকে উনার নাম জিজ্ঞেস করে আমার চাচা তার নাম বললেন , আমার চাচা তাদের উদ্দেশ্যে জিগ্যেস করলেন কি বিষয় আপনারা কারা তারা বললো আমরা একজন ধর্ষণ মামলার আসামী খুঁজতে এসেছি , চাচা বললেন তাহলে আপনারা ভুল জায়গায় এসেছেন।

.

এর পর আমাকে আমার নাম জিগ্যেস করে সাথে সাথে তারা একটা সিগনাল দিলো তাকিয়ে দেখলাম র‍্যাব দিয়ে পুরা এলাকা ভরে গেছে আমার বাড়ির ছাদ থেকে শুরু করে বাড়ির পিছনের কারখানা সব তারা ব্লক করে ফেলেছে।

.

রাস্তা থেকে আমাকে আমার রুমে নিয়ে গিয়ে তারা কিছু বই এবং আমার একটি আ ফ গা নী টুপি নিয়ে তারা আমাকে বাসা থেকে নিয়ে এলো। গাড়ীতে বসিয়ে তারা আমাকে বললো হুজুর আপনার সম্মানের কথা ভেবে আপনাকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে আনি নাই। গাড়িতে বসিয়ে আমার হাতে হ্যান্ডকাফ পড়িয়ে ফেলে।

.

বাড়ি থেকে আমাকে সরাসরি সিলেট র‍্যাব ৯ নিয়ে যায় তখন রাত ৪ বাজে আমাকে ছোট্ট একটি টয়লেটের সাথে একটি সেইলে রাখে। সারাদিন তারা আমাকে বিভিন্ন কিছু জিজ্ঞেস করে , তামীম আল আদনানী শায়েখ জসিমউদদীন রহমানী শায়েখ গুনবি থেকে শুরু করে অনেকের কথা জিগ্যেস করে হাসিবুর রহমান গালিব ভাইয়ের বিষয় ও জিজ্ঞেস করে তখন ও জানতাম না গালিব ভাই গ্রেফতার হয়েছেন। পড়ে গালিব ভাইয়ের গ্রেফতারে মিডিয়ার নিউজ দেখিয়ে বলে তদের একজন সব কিছু বলেছে তুই ও বলবি আব

.

একজন অফিসার আসলো তাকে দেখিয়ে র‍্যাব ৯ এর ক্যাপ্টেন বললো চিনেন তাকে? তখন ঐ অফিসার বললো কে সে? উনি তাকে উদ্দেশ্যে করে বললো এই সেই আবু হুদামা।এই নামে শুনে ঐ অফিসার চমকে উঠে বলে এই সেই? এই ছেলে তো বাচ্চা সেই আমাদের কে নাকে দম করে রেখেছে। এই বলে অনেক গালাগালি করলো বললো তুই অনেক ঘাম ঝড়িয়েছিস এই বলে সৈনিক কে আমায় মারতে বললো। ঐ সৈনিক আমার

দিকে তাকিয়ে আছে এর পর ক্যাপ্টেন ধমক দিয়ে সৈনিক কে গালি দিয়ে আমাকে আঘাত করতো বললো উনি আমাকে আঘাত করতে চায়নি আমার মনে হচ্ছিলো না চাওয়ার পর ও আমাকে আঘাত করলো।

.

তাদের কাছে আমি নাকি আল কা য় দা র বাংলাদেশ শাখার আ ন সা র ইসলামের দায়িত্বশীল সদস্য।আমার তত্বাবধানে নাকি এই দেশ থেকে হিজরতে যায়।

.

তখনও আমাকে গুম করা হয় নাই , সিলেট থেকে আমাকে তারা ফটোসেশান শেষ করে গাড়িতে করে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে জানি না। কিন্তু গাড়িতে যেই র‍্যাব গুলা ছিলো তারা প্রতিটি লোক আমার কাছে ক্ষমা চাইলো বললো আপনার জন্য আমারা কিছু করতে পারি নাই আমাদের ক্ষমা করবেন।

.

সকাল ৮ টায় তারা আমাকে নিয়ে উত্তরায় র‍্যাব হেডকোয়ার্টারে পৌছায় একটু পর দুইজন লোক এসে তাড়াহুড়ো করে আমার চোখ বেঁধে ফেলে এর উপর আবার একটি কালো বড় টুপি পরিয়ে ফেলে (এই টুপি ফাঁসিতে ব্যবহার করে) এই টুপি পরিয়ে আমাকে টানা হেচড়া করে হেডকোয়ার্টারে উপরে নিয়ে যায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিলো আমি নিশ্বাস নিতে পারছিলাম না। উপরে উঠিয়ে ঐ টুপির একটু নাকের উপরে উঠিয়ে দেয় আমি তখন জোরে জোরে নিশ্বাস নিলাম আহ😥

.

এখান থেকেই শুরু হয় গুমের সেই ১৪ দিনের নির্যাতন।

জম টুপি পরিয়ে আমাকে টানা হেচড়া করে হেডকোয়ার্টারে উপরে নিয়ে যায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিলো আমি নিশ্বাস নিতে পারছিলাম না। তাদের আমি বলতে ছিলাম আমি নিশ্বাস নিতে পারছি না তখন তারা উপরে উঠিয়ে ঐ টুপির একটু নাকের উপরে উঠিয়ে দেয় আমি তখন জোরে জোরে নিশ্বাস নিলাম

.

আমাকে একটা চেয়ারে বসালো মিনিট খানিক পর একজন এসে আমার কাঁধে থাপ্পর দিয়ে খুব রাগান্বিত ভাবে বললো নাম কি? আমি বললাম শামিম তার পর বললো এখানে কিভাবে আসলেন? আমি বললাম র‍্যাব ৯ সিলেট থেকে এখানে দিয়ে গেছে, উনি বললেন আচ্ছা।

.

এরপর কিছুক্ষণ পরে আবার আরেকজন এসে একই ভাবে একই কথা জিগ্যেস করলো এর পর থেকে প্রায় ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা আমাকে চেয়ারে বসিয়ে রাখে তখন সময় কত আমি জানি না তবে রাত ৮টা বা ৯ টা

এমন হবে ,দুইজন এসে আমার দুই হাতে ধরে চেয়ার থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করতেছি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমার চোখ খুলে দেন। তারা আমাকে ধমক দিয়ে বলে চুপ থাক বেশি কথা বলবি না

.

সিঁড়ি দিয়ে নেমে সামনে একটি হাইলেক্সে উঠিয়ে ফেলে গাড়িতে বসিয়ে আমার মাথা কে গাড়ির সিটের নিচে নিচু করে রাখতে বলে কিছুক্ষণ গাড়ি চলার পর র‍্যাব ১ এর ভিতরে ডুকে (একটি কথা বলে নেই আমি তখন জানতাম না আমাকে কোথায় নিয়ে রাখা হচ্ছে)

.

গাড়ি থেকে নামিয়ে আমাকে ধরে সিড়ি দিয়ে উঠাচ্ছে তখন আমার পা আর সিড়ি ছারা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না সিড়িতে এত পোকামাকড় পড়ে আছে আর খুব বাজে গন্ধ ছিলো, সিড়ি দিয়ে তিন তলা পযন্ত উঠিয়ে একটি দরজার সামনে দাঁড়ায় ,একটি লোক দরজা খুলে দেয় দরজা টা লোহার ছিলো এর পর আরেকটি দরজা খুলে আমাকে সেল এরিয়ায় ডুকিয়ে আমাকে যেই সেলে রাখবে সেই সেলর তালা খুলে সেলে ডুকালো। এখানে জেনেরেটর ছাড়লে যেমন শব্দ হয় ঠিক এমন শব্দের একটা কিছু চলছে যেনো কারো চিতকার বা আওয়াজ বাহিরে না।

.

সেইলে ডুকিয়ে আমার হ্যান্ডকাফ খুলে দিলো আমাকে একটি ছেড়া গেঞ্জি আর খুব বাজে একটি লুঙ্গি দিয়ে বললো আপনার পাঞ্জাবি পায়জামা খুলে এই গুলা পরেন তখন চোখের কাপড় খুলে দেয় কিন্তু পিছনে তাকাতে কঠোর ভাবে নিষেধ চোখ খুলে যখন সেইলের দেয়ালে চোখ গেলো আমি এই প্রথম খুব ভয় পেয়ে যাই।

.

দেয়াল গুলাতে অনেক কিছু লিখা ছিলো কেউ লিখে রাখছে মা আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও , আল্লাহ আমাকে বাঁচাও কেউ আবার কত দিন যাবত এখানে আছে তা লিখে রাখছে আবার কেউ দাগ দিয়ে দিয়ে গননা করে রাখছে কতদিন যাবত এখানে আছে।

.

এর কারণ কয়েক দিন পড় আর টাইমিং মেলানো যায় না আজ কি বার কত তারিখ আর সময়ের হিসাব ছিলো না এখন টাইম কত, তারপর কাপড় খুলার পড় পুনরায় আমার চোখ বেঁধে আমাকে বের করে এখন আর তারা আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে না একজন লাঠি নিয়ে সেইলের লৌহাতে আওয়াজ করে বলছে সামনে আগান এর পড় বায়ে জান আবার সামনে যেতে থাকেন সামনে যেতে যেতে আমি দরজায় ধাক্কায় খেলাম এর জন্য ও সে

আমায় শাসালো এর পড় আমার হ্যান্ডকাফ খুলে আমার পাঞ্জাবী আর পায়জামা হাতে দিয়ে বললো গোসল করে এই গুলা ধুয়ে নিয়ে আসুন।

.

আমি বললাম আমার কাপড় পরিস্কার এই গুলা ধোয়ার প্রয়োজন নেই সে আমাকে লাঠি দিয়ে একটি গুতা দিয়ে বললো যা বলছি তা কর।তাদের কথা মত গোসল শেষ করে সেইলে আসি আমাকে একটি কম্বল দিলো যেইটা বিছিয়ে ঘুমাবো ঐ কম্বল টা বিছিয়ে দেখি বড় করে একটা ক্রস চিহ্ন দেওয়া আমি এইটা দেখে ভয় পেয়ে যাই মনে অনেক রকম কথা আসে ,তারা আমার সাথে কি করতে যাচ্ছে তারা কি আমাকে ক্রস ফায়ার করে মেরে ফেলবে অনেক কিছুই মনে আসতে ছিলো। পরিবারের কথা বিবির কথা মনে হলে আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে যেতো তাদের কথা মনে হলে আমি ভেঙে পড়তাম আর তাদের সাথে আমার দেখা হবে না।

.

পড়ের দিন আমাকে আবার র‍্যাব হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যায় এইদিন ও আমাকে প্রায় ৪/৫ ঘন্টা বসিয়ে রাখে যেই রুমে আমাকে বসিয়ে রাখে এই রুমটা এত ভ:য়ংকর ছিলো কেউ না দেখলে বুজবে না রুমের দেওয়ালে ছিলো ভূতের মত ছবি চোখ উপরে ফেলা রক্তাক্ত ছবি মাথা ঝুলে আছে এমন ছবি , ইলুমিনিয়াতের সিম্বল ,ফাসির দরি, ইলেকট্রিক চেয়ার , লৌহার কাটা যুক্ত বড় প্লেট যার উপরে বসিয়ে রাখে।

.

৪/৫ ঘন্টা পড় আমাকে জিজ্ঞেসাবাদের জন্য কেউ আসে তারা আমাকে সিলেটের মহিউদ্দিন, তামিম আল আদনানী , মেজর জিয়া, আর ও নাম না জানা অনেকের কথা জানতে চায় , আমি বললাম আমি তাদের কাওকে চিনি না। তারা যা জানতে চায় তা না পেয়ে আমাকে অমানুষিক নির্যাতন করে ইলেকট্রিক সট থেকে শুরু করে ইচ্ছামতন পেটানো কিছুই বাদ রাখে নাই।

.

আমাকে আহত অবস্থায় রাতেই তারা কোথাও নিয়ে বের হয় আমাকে বলে তারা আমাকে মেরে ফেলবে বলেই বলে ,-আল্লাহ কে ডাক।

.

আমাকে আমাদের এলাকার একটা কবরস্থানের কাছে নিয়ে গাড়ি থামায়। আমি সেই দিন বুজে গেয়েছিলাম আমাকে তারা আজ এখন মেরে ফেলবে আমি ও আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর সাহায্যে অবিচল ছিলাম তওবা করে কালেমা পাঠ করে প্রস্তুত ছিলাম এইটা আমার শেষ সময় আর বাবা, মা স্ত্রী কাওকে দেখা হবে না। আমি তাদের কে আল্লাহর জিম্মায় ছেড়ে যাচ্ছি।

.

কিন্তু তাদের প্লান চেইঞ্জ হলো ঝালাকান্দী কবরস্থানের এখানে গাড়ি থামিয়ে যে প্রথমে বের হলো তার সামনে আরেকটি গাড়ি ছিলো সেই গাড়িতে বড় কোন অফিসার ছিলো

.

তার সাথে কথা বলে এসে দরজা লাগিয়ে বলবো মিশন কেন্সেল। এই বলে গাড়ি ছেরে দিলো আমাদের এলাকার দিকে তখন মনে হচ্ছিলো আমাকে ছেড়ে দিবে কিন্তু তারা আমাদের এলাকা থেকে আর একজন সাধারণ মুদি দোকানদার গোলাম কিবরিয়া নামের এক ভাইকে তার সদ্য বিবাহিত স্ত্রীর কাছ থেকে দরজা ভেঙে নিয়ে আসে উনার উপর তখন গোসল ফরজ ছিলো এমন অবস্থায় তাকে তুলে নিয়ে তারা আবার র‍্যাব ১ আয়না ঘরে ফিরে আস। আর লিখতে চাই না শেষ হবে না আর ও অনেক কিছু তারা করেছে।

.

যেইদিন আমাকে ও গোলাম কিবরিয়া ভাইকে তারা ছাড়ে সেই দিন আমাকে বলে এক অফিসার যে তোর ভাগ্য ভালো তোর বাবা মায়ের দোয়ায় আল্লাহ তরে বাচাইছে। এখান থেকে কেউ ফিরে যেতে পারে না তদের কে ছেড়ে দিচ্ছি কিন্তু যদি কিছু কখনো বলিস এই বিষয়ে তাহলে আবার তুলে আনবো। আমাকে যখন চোখ খুলে দেয় ১৪ দিন পড় আমি আলো দেখি আমি প্রায় ঘন্টা খানিক তাক্তে পারছিলাম না আস্তে-ধীরে সাভাবিক হয় আলহামদুলিল্লাহ।

.

এই পযন্ত শেষ করলাম আপনাদের দোয়া চাই আল্লাহ যেনো এই উম্মাহের জন্যে কোন খেদমতে আমায় কবুল করেন।

আয়নাঘরনামা ২১

টর্চারের একটা কমন মেথর্ড হচ্ছে , শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি লাঞ্ছিত করা, দ্বীণের উপর আঘাত করা । প্রায়ই হাত পায়ে হ্যান্ডকাপ দিয়ে অর্ধ-উলংগ করে (শুধু মাত্র আন্ডারওয়ার) পড়িয়ে ফ্লোরে ফেলে রাখত আর মাঝে মাঝেই লাথি মারা হতো । আর দ্বীনের উপর আক্রমণ করাটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল ।

কোন এক অফিসার ছিল, একটু বয়স্ক , একাধিকবার হ্বজ করা। সে হাত পা বেধে ফেলে রেখে মাঝেই মাঝেই বলত, কিরে আমারে দাওয়াত দে।আমাকে কনভিন্স কর। একদিন ডেকে নিয়ে যাবার পর শুনি সে হ্বজে গেছে । আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে এক কন্সস্টেবল আরেক কন্সস্টেবলকে বলছিল, বা** স্যার তো হ্বজে গেছে আর মে*** স্যার আসার সময় মাল(মদ) নিয়ে আসতে বলছে। সেখানকার মাল অনেক ভালো ।

আর গুমের ব্যাপার টা প্রায় ওপেন সিক্রেটের মত ছিল, ঐক্ত গোয়েন্দা সংস্থার বাইরেও প্রায়ই অনান্য ডিপার্টমেন্ট থেকে পুলিশ আসত , তাদের সামনেই চলত ইন্টারোগেশন, অর্ধ-উলংগ করে ফেলে রাখা হতো । তারা জিজ্ঞেস করলে , তাদের সামনে আমাদের নিয়ে হাসাহাসি ঠাট্টা মশকরা করা হতো । এমন কি গায়ের ঝাল মেটাতে মামলা দিয়ে জেলে পাঠানোর পরেও নতুন কাওকে গুম করে আনলে তাদের কে নির্যাতনের কাহিনি শোনানো হতো , তাদের সামনেও গালি গালাজ করে এরা ঔদ্ধত্ব প্রকাশ করত ।